আর ছাড়বো না নামায

মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন

তার ছাড়া না নামায

হাতেগোনা কিছুদিন একটু ভালো থাকার জন্য দুনিয়া ঘুরে অফিস করতে পারেন, একটু সিকিউরড লাইফ আর একটা ভালো চাকরির আশায় পুরো রাত জেগে বিসিএসের পড়া পড়তে পারেন, পড়া মুখস্থ করার জন্য রাত জেগে জেগে চোখের নিচের অংশ কালো বানিয়ে ফেলতে পারেন, গান শেখার জন্য ভোরে পাখিদের ওঠার আগেই রেওয়াজ শুরু করতে পারেন, অফিসে দেরী হওয়ার ভয়ে ফজরের আগেই অফিসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে পারেন, এক্সামে ভালো সিজিপিএ আর হাইয়ার গ্রেডের জন্য কফি খেয়ে টলতে টলতে পড়া রিভাইজ করতে পারেন, গণিতের ভালোবাসায় এক সমস্যা নিয়ে দিনের পর দিন পড়ে থাকতে পারেন, IELTS এ ৭.৫+ পাওয়ার জন্য প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা ইংলিশ প্র্যাক্টিস করতে পারেন; তবে কি কবরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার জন্য আপনি ঈমানের ন্যূনতম দাবীও পূরণ করতে পারেন না? ৫০ হাজার বছরের সমতুল্য কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য নামাযটা পড়তে পারেন না? দুঃস্বপ্ন থেকেও ভয়ানক পুলসিরাতের মরণব্রিজ পার হওয়ার জন্য নামাযের নূর সংগ্রহ করতে পারেন না?

আর ছাড়বো না নামায

বই :	আর ছাড়বো না নামায
লেখক :	মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন
প্রকাশনায় :	রাইয়ান প্রকাশন

ওরে হতভাগা নামায

মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন

রাইয়ান প্রকাশন

আর ছাড়বো না নামায

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০২২

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

ইমেইল
raiyaanprokashon@gmail.com

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মার্জিন সলিউশন, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা- ১১০০, ফোন : ০১৭৫৯৮৭৭৯৯৯

প্রচ্ছদ
সিদ্দিক মামুন

অঙ্গসজ্জা
বর্ণায়ন

বইমেলা পরিবেশক
নহলী

মুদ্রিত মূল্য
৮০/- টাকা

Ar Charbo Na Namaz
Published By: Raiyaan Prokashon

সূচিপত্র

দিনগুলো পড়ে মনে	০৭
নামায কি খুব কঠিন কিছু?	১০
তারপর কী হবে?	১২
কিন্তু নামায পড়তে কষ্ট লাগে যে!	১৯
ভাইয়া! আমি সবই বুঝি!	২৭
আসলেই বিশ্বাস করি তো?	২৮
বয়স হলে নামায ধরবো!	৩১
আমার অন্তর তো পরিষ্কার! নামায লাগে না!	৩৭
আল্লাহ তো ক্ষমাশীল!	৩৮
আরও কিছু কথা	৩৯
জীবন্ত নামায	৫১
শেষকথা	৫৪

দিনগুলো পড়ে মনে

চারিপাশে আগুন। লেলিহান আগুন। এক অংশ আরেক অংশকে গিলে খাচ্ছে যেন। এখনই কাউকে ধাক্কা দেয়া হবে সেই আগুনে। আরও অনেকেই আছে যাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে সেই আগুনের সমুদ্রে। অনেক দূরে আরও একদল লোক। তবে তাদের আগুনে ফেলা হবে না। তারা তো আগুনের ধারে কাছেও নেই। তারা মনোরম বাগানে আরাম-আয়েশে বসে আছে। চারদিকে অজস্র ফল-ফলাদি আর পানীয়ের সমাহার। অপার্থিব সুন্দর বাগানের নায-নিয়ামত ভোগ করছে। বসে বসে আগুনের বাসিন্দাদের নিয়ে আলোচনা করছে। হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন আগুনের বাসিন্দাদের একজনকে কি যেন জিজ্ঞেস করে বসলো। দূর হওয়া সত্ত্বেও আগুনের বাসিন্দারা পরিষ্কারভাবেই তার কথা শুনতে পেলো। সে জিজ্ঞেস করছে,

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ

তোমাদের এই আগুনে কোন জিনিস নিক্ষেপ করছে?

আগুনের বাসিন্দারা জবাব দিলো,

لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।[১]

সেদিন আগুনের ধারে বসে পৃথিবীতে কাটানো দিনগুলোর কথা মনে পড়বে তাদের। খুব মনে পড়বে। স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠবে পৃথিবীতে কাটিয়ে আসা

১. সূরা মুদ্দাচ্ছির, ৪২-৪৩

সেই দিনগুলোর কথা। তবে স্মৃতি হবে খুবই যন্ত্রণাদায়ক। দগদগে ফোড়ার মতন কষ্টদায়ক। হবে আফসোস আর হতাশায় ভরা। মনে করতে থাকবে কীভাবে তারা দিনের পর দিন নামায ত্যাগ করেছে। ফজরের আযান দিয়েছে। রাতের নীরবতা ভেঙেছে। কিন্তু তখনো তারা ছিলো গভীর ঘুমে মগ্ন। পাখিরা জেগে উঠেছিলো তবে জাগতে পারেনি তারা। কেন? 'আরেকটু ঘুমিয়ে নিই' 'সকালে ঘুম থেকে উঠতে অনেক কষ্ট হয়' 'এখন না ঘুমালে অফিস/ভার্সিটি/কলেজ/স্কুলে গিয়ে ঘুম আসবে' এসব বাহানা দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রেখেছিলো। আচ্ছা, ফজরের পরে যুহরের কি হলো? তা পড়েনি কেন? ও হ্যাঁ, ভুলেই গেছি, ওই সময় তারা অফিসে থাকত, নাহয় ভার্সিটিতে, নাহয় নিজের ঘরের কাজ, বাচ্চা-কাচ্চাসহ হাজারো ঝামেলার! মধ্যে; তাই নামায পড়ার সময় করা হয়ে ওঠেনি তাদের। এভাবে আসরের সময়ও চলে গিয়েছিলো, হয়ত বাসে বসে পাবজি গেইম খেলায় ব্যস্ত ছিলো কেউ, কেউ কেউ সারাদিন ভার্সিটি শেষে বাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঘুমের চোটে হাই তুলছিলো, আবার কেউ কেউ মশগুল ছিলো ম্যাসেঞ্জারে নিজের গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতে, কোন স্টিকারটা তার মনের ভাবখানা বেস্টাম বেস্টভাবে প্রকাশ করতে পারে সেই পরিসংখ্যান কষতে কষতে মন ছিলো মশগুল, নাহয় পুরো মার্কেট ঘুরে বেস্ট জামাটা কেনার জন্য এ জামা ও জামা হাতড়ে বেড়াচ্ছিলো একদল; যাই হোক, নামাযের জন্য মসজিদের দিকে যাওয়া তাদের হয়নি। মুসাল্লাটা নিয়ে বাসায় নামাযটা পড়ার মত ফুরসতও তাদের মেলেনি। আর মাগরিবের সময় বাদুড়ের মত ঝুলে ঝুলে অফিস থেকে ফিরতে হত বাসায়, ফিরতে ফিরতে একটু ফেইসবুকে ঢু মেরে এর ওর পোস্ট দেখা, লাইক-কমেন্ট-শেয়ার করা, নাহয় কোচিংয়ে পড়তে যেত হত, আর তা নাহলে ঘরে সিরিয়াল দেখার মত গুরুত্বপূর্ণ! কাজের মাঝে নামাযের কথা ঘুণাক্ষরেও মনে পড়েনি তাদের, যদিও চুলায় দেয়া ডালটা উথলে উঠলো কিনা তা দেখার জন্য বেশ কয়েকবারই রান্নাঘরে যাওয়া হয়েছিলো, তবে দেরি একদন্ডও করেনি, তাড়াতাড়ি ফিরে এসেই বসে পড়েছিলো দূরদর্শনের অপেরা শো দেখার জন্য। আর এশা! সেটা তো রিমোট নিয়ে বিশ্বের খবর দেখার সময়, বাসার সবাই মিলে একটু-আধটু গল্পগুজব করার টাইম, ওই সময় কি নামায পড়া যায়? তারপরে যা কিছু সময় থাকে তখন কি খাওয়া-দাওয়ার পর আর শরীরটা চলে? সারাদিন খাটাখাটনির পরে কি আর ওই সময়ে কিছু করা যায়? একদমই না। এই ভাবনা ভেবে মনটাকে বুঝ দিয়ে তারা প্রবেশ করেছিলো ঘুমের রাজ্যে। এভাবেই লাটিমের

মত ঘুরত তাদের দিন আর দৈনন্দিন রুটিনের চক্র। যেখানে ছিলো না আখিরাতের জন্য সময়, আর না সময় ছিলো নামাযের। আজ তারা সেদিনের কথাগুলো মনে করছে। মনে একগাদা হতাশা আর না পাওয়ার যন্ত্রণা করছে ভিড়, নষ্ট করা সেই মুহূর্তগুলোর জন্য হচ্ছে নিজের ওপর রাগ। কিন্তু কিছুই করার নেই। কিচ্ছুটি নয়। সময় হাত থেকে ফসকে গেছে। সেদিন তারা আপনা থেকেই বলে উঠবে,

يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

"হায়! আমার এই (আখিরাতের) জীবনের জন্য আমি যদি আগেভাগেই কিছু পাঠাতাম।"[২]

২. সূরা ফজর, ৮৯ : ২৪

নামায কি খুব কঠিন কিছু?

নামায কিন্তু খুব কঠিন কাজ! অনেক কঠিন! এই ওঠো, তারপর প্রয়োজনীয় কাজ সারো, তারপর পানি দিয়ে হাতমুখ-মাথা ধোও, এরপর আবার জামাকাপড় পরো, হেঁটে হেঁটে মসজিদে যাও, এত কষ্ট কে করে? যে কাজ করতে কষ্ট হয় সে কাজ করার কি দরকার? কোনোই দরকার নেই, রেখে দাও। অত্যন্ত যৌক্তিক বাহানা বটে! কিন্তু আসলেই বাস্তবতার নিরিখে কি এই বাহানা টেকে?

মনে করুন, আপনার অফিস বাসা থেকে অনেক দূরে। আপনি থাকেন ঢাকা সিটিতে আর আপনার অফিস নারায়ণগঞ্জে কিংবা গাজীপুরে। সকালটা হলেই ভেতর থেকে অদৃশ্য অ্যালার্ম বাজিয়ে কে যেন জাগিয়ে তোলে আপনাকে। প্রতিদিন সকালে উঠছেন। মুখহাত ধুচ্ছেন। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিচ্ছেন। ব্যাগে ল্যাপটপটা নিলেন কি না, টিফিন বক্সটা ঢুকালেন কি না, মোবাইলটা পকেটে আছে কি না দেখেটেখে আপনি রওয়ানা হয়ে গেলেন। টেম্পু করে বাসস্ট্যান্ড। তারপর সেখান থেকে দেড় থেকে দুই ঘন্টার রাস্তা পার হয়ে আপনার অফিস। নাহয় কমলাপুর যেয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা। অপেক্ষার প্রহর কখনো আধা ঘন্টা কখনো এর বেশিও হয়। কিন্তু তারপরও ট্রেন আসামাত্রই আপনি চড়ে বসেন। নিজের সিটটা দখল করেন। কারণ? আপনাকে অফিসে যেতে হবে যে। অফিস না করলে, ইনকাম না করলে, আপনার বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তানরা কি খাবে? উপার্জন না করলে তাদের মুখে অন্ন কীভাবে তুলে দেবেন? তাদের ভরণপোষণ আপনি কীভাবে করবেন? সারাদিন অসহনীয় কষ্ট আর পরিশ্রমের পর সেই আপনি আবার একইভাবে বাসায় ফেরেন। বাসের দীর্ঘ জ্যামে বসে থেকে, কখনো বা হেঁটে হেঁটে, ঘামে ভিজে নেয়ে, কখনো ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে। বাসায় ফেরেন ভালোবাসার স্ত্রীর জন্য, সন্তানের হাসি, খুনসুটি আর দুষ্টুমি দেখার জন্য, বুড়ো মা-বাবার স্নেহ আর হাতের ছোঁয়া পাওয়ার জন্য। এই পুরো পরিবার

আপনার ওপর নির্ভরশীল। তারা আপনার রক্ত পানি করা অর্থের ওপরই বেঁচে আছে। এতকিছু ভাবলে আপনার সারাদিনের কষ্ট গলে পানি হয়ে যায়। রাতে এসে এদের আদর-স্নেহ-ভালোবাসা আপনাকে পরেরদিন বাসা থেকে ঘুম কামাই দিয়ে ভোরের দিকে বের হওয়া, গিয়ে রিকশা পাওয়া না পাওয়ার টেনশন, বাসটা ঠিকঠাক মত ধরার চাপ, একলাফে কিংবা দৌড়ে বাসে ওঠার ঝুঁকি, বাসে ঘুমুতে ঘুমুতে বা ঝিমুতে ঝিমুতে অফিসের দিকে যাওয়ার যন্ত্রণা, অফিসে দেরি হলে স্যারের বকা খাওয়ার ভয়, তারপর সারাদিন অফিসে কাজের ভার, উর্ধ্বতনের গঞ্জনা সবকিছু অবলীলায় সহ্য করার এক আশ্চর্য ক্ষমতা দেয়। সত্যি বলছি না আমি?

কিন্তু সেই তুলনায় নামায আসলে কতটুকু কঠিন? শরীয়ত মোতাবেক ওযু করে তারপর ফরযটা আর তারপর কিছু সুন্নাত, ব্যস! এত কষ্ট করতে পারছেন দুনিয়ার জন্য আর সেই তুলনায় অনেক কম কষ্ট করতে পারবেন না আখিরাতের জন্য? যেই আখিরাতের জীবনের কোনো তুলনাই দুনিয়ার জীবনের সাথে হয় না, হতে পারে না। দুনিয়ার জীবন যদি পানির একটি ফোঁটা হয়, তবে আখিরাত কূলহীন বিশাল সমুদ্র। পানির একটি ফোঁটার জন্য কষ্ট তো অনেক করেছেন, আখিরাতের কী হবে, ভেবেছেন কি ভাই? আপনিও ভেবেছেন কি কিছু, বোন? ভেবে দেখুন না! নামায কঠিন—এই অযুহাতের যৌক্তিকতা আসলে কতটুকু! আমার মনে হচ্ছে না এই কথার আদৌ কোনো যৌক্তিকতা আছে। সব হচ্ছে আমার ও আপনার ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা। আমাদের যদি নামাযের প্রতি নিষ্ঠা থাকে, আমরা যদি নামাযের মত ফরয আদায়ে দায়িত্ববান হই তবে আমাদের কাছে নামায মোটেও কঠিন কিছু মনে হবে না। অফিস করা, পড়াশোনা করার পেছনে অন্তরের খাঁটি নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা আছে, তাই আমাদের এসব কাজ করতে হাজার কষ্ট হলেও তা গায়ে লাগে না, দিব্যি করা হয়ে যায়। যেই কাজের প্রতি ঐকান্তিকতা থাকে না, সেই কাজের সামান্য কষ্ট দেখেই পিছিয়ে যাওয়া হবে, এটাই কিন্তু স্বাভাবিক। ব্যাপারটা হচ্ছে আসলে অন্তরের, অন্তরের নিয়্যাতের, ইন্টেনশনের। তাই ভাই ও বোন আমার! নামাযের প্রতি নিষ্ঠা আনুন। তবে দেখবেন আপনার আর কষ্ট মনে হচ্ছে না নামাযকে। আর দেরী নয়! আজ থেকেই শুরু করুন নামায, অন্তরের বিশুদ্ধতা ও নিষ্ঠা সহকারে নামায। এখন থেকেই। নামায কিন্তু ওত কঠিন নয়, মোটেও নয়।

তারপর কি হবে?

অফিস, বাসাবাড়ি, স্কুল, কলেজ, কোচিং, স্বামী-স্ত্রী, বাচ্চাকাচ্চা, ভাই-বোন, সংসার.....কিন্তু..... কিন্তু কখনো ভেবেছেন তারপর কি হবে? সেদিন কি হবে যেদিন আপনার প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবে? যেদিন দীর্ঘদিনের অতি পরিচিত শরীরের খাঁচার বন্ধন থেকে বের হয়ে যাবে আপনার আত্মাটি। সেদিন আপনার সকল কষ্ট-পরিশ্রম এই নশ্বর দুনিয়াতেই ফেলে রেখে রওয়ানা দেবেন চিরন্তন আখিরাতের দিকে। আর সেই যাত্রার প্রথম ঘাঁটি কবর। তো কবরের তিনটি প্রশ্নের জন্য কি আপনি প্রস্তুত? সেই তিনটি প্রশ্নের জবাব কতটুকু তৈরি করতে পেরেছেন আপনি? আচ্ছা, কবর, কবরের প্রশ্ন, আখিরাত এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস তো করি আমরা, তাই না? তাই তো? সত্যিই তো? আখিরাতে বিশ্বাস না করলে মুমিন হওয়া যায় না। আখিরাতে বিশ্বাস আমাদের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যদিও অতি ব্যস্ত এই দুনিয়ায় আমাদের আখিরাত থেকে ভুলিয়ে রাখার সকল প্রকার ফন্দি আঁটা হয়েছে। চারিদিকে সেই পরিকল্পনা মোতাবেক জাল বিছিয়ে রাখা হয়েছে। সেই ধুন্ধুমারে পড়ে গেলে আখিরাতকে কেমন যেন আগের যুগের কথা মনে হয়। দুনিয়া তখন একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে যায়। মানুষ বেখেয়াল হয়ে পড়ে আখিরাত থেকে। কিন্তু না! আখিরাত বাস্তব। অতীব বাস্তব। আখিরাত হবেই, নিশ্চিতভাবেই।

আচ্ছা, ফিরে আসি আবার। ফেরেশতারা যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করবেন 'তোমার রব কে?' তখন কি আপনি নির্দ্বিধায় বলতে পারবেন—আপনার রব আল্লাহ? মনে রাখবেন, দুনিয়া থেকে যতই মুখস্থ করে যান না কেন, সেই অন্ধকার কবরে কিন্তু সেই মুখস্থবিদ্যা আমার আপনার এক পয়সার উপকারও করতে পারবে না। নিজের আমল দিয়েই সেই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। দুনিয়া

থেকে ঠোঁটস্থ করে নিলেও আপনার অন্তর যদি সায় না দেয়, দুনিয়া থেকে যদি আপনি সত্যিই আল্লাহকে রব না মেনে থাকেন, রবের দাবী মোতাবেক কাজ না করে থাকেন, তবে সেই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আপনি দিতে পারবেন না। আপনার অন্তর সায় তখনই দেবে যখন দুনিয়ায় থাকতে আপনার আমল সে রকমই থাকবে যেমনটা হলে আপনি উত্তর দিতে পারবেন। আপনার আমল যদি দুনিয়াতে এমন হয় যে আপনি আল্লাহকে রব মেনেই দুনিয়ার জীবনকে পরিচালনা করেছেন, তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলেছেন, তবেই আপনি সেদিন এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন, অন্যথায় নয়।

তো সেই কবর, যেই কবরের মধ্যে আসা প্রত্যেককে সে এমন চাপ দেবে যে এক হাড় আরেক হাড়ের মধ্যে ঢুকে যাবে, সেই কবরের প্রথম প্রশ্নের জবাব দিতে আপনি তৈরি আছেন তো?

আপনার দৈনন্দিন আমল কি তা-ই প্রমাণ করে? আপনি তো আপনার পরিবার-পরিজনের জন্য সবকিছু বিলিয়ে দিলেন, সর্বস্বটুকু দিয়ে প্রমাণ করলেন আপনি তাদের ব্যাপারে কনসার্নড, আপনি তাদের কেয়ার করেন। সারাদিন সন্তানদের লালনপালনই প্রমাণ করে আপনি মা হিসেবে কতটা সিনসিয়ার, নিজ দায়িত্ব পালনে একেবারেই পারফেক্ট আপনি। পড়ালেখার ক্ষেত্রে আপনার মত এমন যত্নবান-মনোযোগী ছাত্র/ছাত্রী দ্বিতীয় আরেকটা পাওয়া মুশকিল অথবা না মুমকিন। কিন্তু আপনাকে দেখে কি মনে হয় যে আপনি আল্লাহকে রব মেনে জীবন পরিচালনার ব্যাপারেও কনসার্নড, সিনসিয়ার, যত্নবান, মনোযোগী?

কাউকে রব মানার মানে হলো রবের সকল আদেশ মেনে চলা ও নিষেধ বর্জন করা। আমার আর আপনার রব আল্লাহর আদেশ হলো ঈমান আনা। আর ঈমানের পরে সর্বপ্রথম দায়িত্ব নামায আদায় করা। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ই প্রমাণ করে আপনি অন্তরে অন্তরে সব সময়ই আল্লাহকে রব মানছেন। সেদিন আল্লাহর কাছে আপনার এই কালিমার স্বীকৃতি কোনো কাজেই আসবে না যদি আপনার আমল দিয়ে আপনি প্রমাণ না করতে পারেন যে আপনি আল্লাহকেই রব বলে মেনেছেন, মেনে এসেছেন। সেদিন কাজে আসবে কেবল অন্তরের এই ঈমানটুকুই। নামাযই আপনার অন্তরে থাকা ঈমানের প্রমাণ। এই নামাযই আপনার ঈমানের দলীল, আপনার ঈমানের হুজ্জত। প্রতিদিন পাঁচ বার নামায পড়ার মাধ্যমে

আপনি প্রমাণ দিচ্ছেন আপনি কবরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে তৈরী হচ্ছেন, খুব চেষ্টা করছেন, প্রাণপণ খেটে যাচ্ছেন। কিন্তু আপনার অফিস, স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি, কোচিং, বাসা-বাড়িসহ আরও নানান কাজে আপনি ভুলেই যাচ্ছেন আপনার রবের কথা, কবরের প্রশ্নগুলোর কথা। যেদিন কবরে একমুঠো মাটি ফেলে সবাই আপনাকে একা ফেলে চলে আসবে। তবে কি সেদিনের ভয়াবহতার ব্যাপারে আপনি চরম অবহেলা প্রদর্শন করছেন? কিন্তু জানেন কি নামায যে ঈমান ও কুফরীর মধ্যে একমাত্র বাহ্যিক পার্থক্য? রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো হাদীছে এমনটাই বলেছেন, তিনি বলেন,

بين الرجل وبين الشِّرْك والكفر تَرْكُ الصلاة

একজন ব্যক্তি এবং কুফর ও শিরকের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে নামায পরিত্যাগ করা। [৩]

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহকে (রাদিআল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করা হলো, "রাসুলুল্লাহর যুগে কোন কাজ পরিত্যাগ করাকে আপনারা কুফর বলে মনে করতেন?" তখন তিনি জবাব দিলেন, 'নামায'। (খাল্লাল তাঁর কিতাবুস সুন্নাহতে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন)

তাছাড়া রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীরা নামায পরিত্যাগ করা ছাড়া (ইসলামের) অন্য কোনো কাজ পরিত্যাগ করাকে কুফর বলে মনে করতেন না। (তিরমিযী ও মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ)

ভেবে দেখেছেন কতবড় ভয়ানক কথা এটা? কুফর? এর মানে বুঝতে পারছেন তো? কুফর হলো ঈমানের বিপরীত। কুফর মানে আল্লাহর প্রতি ঈমানকে অস্বীকার করা। নামায ত্যাগ করা এক ধরণের কুফরী। তাহলে যে ব্যক্তি আজীবনই ঈমানের বদলে কুফরীকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে, ঈমানের বদলে কুফরীর ওপর আমল করেছে, সেই ব্যক্তির জন্য কি আশা করা যায় সে কবরের প্রথম প্রশ্নটির জবাব দিতে পারবে? কিভাবে ভাবা যায় সেই ব্যক্তি আল্লাহকে রব বলে উত্তর দিতে সক্ষম হবে? ভেবে দেখুন!

---

৩. সহীহ মুসলিম

এরপরে আসুন দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব নিয়ে ভাবি। কবরে ফেরেশতারা দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি করবেন তা হলো, 'তোমার দ্বীন কি?' দ্বীন অর্থ হলো আনুগত্য সহকারে কোনো জীবনব্যবস্থা মেনে নেওয়া। আমাদের দ্বীন হলো ইসলাম। আর ইসলামই আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম।[৪]

আমাদের দ্বীনের পাঁচটি খুঁটি বা বুনিয়াদ আছে। সেই বুনিয়াদের একটি হলো নামায, যার স্থান ঠিক ঈমানের পরপরেই। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ

ইসলামকে পাঁচটি বুনিয়াদের উপর দাঁড় করানো হয়েছে, এক. এই সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহই একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য সত্তা ও মুহাম্মাদ তাঁর প্রেরিত রাসূল; দুই. নামায কায়েম করা।[৫]

উমার (রাদিআল্লাহু আনহু) তাঁর জীবনের শেষ মূহুর্তে। ফজরের শেষ রাকাতে তাঁকে এক ফারসি মূর্তিপূজক গোলাম আবু লুলু ছুরিকাঘাত করেছে। তাঁর পেট দু-ভাগ হয়ে গেছে। তিনি নামায ছেড়ে দিয়ে ব্যাথায় কাতরে উঠেছেন। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। যখনই তাঁর জ্ঞান ফিরলো তখনই তিনি সর্বপ্রথম নামাযের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, নামায পড়া হয়েছে কি না। তখন কেউ কেউ বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, এই সময়েও নামায? তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন,

لا حظَّ في الإسلام لمن تَرَكَ الصلاة

"যে নামায পরিত্যাগ করে ইসলামে তার কোনো অংশই নেই,"[৬]

---

৪. সূরা আল ইমরান, ১৯

৫. সহীহ মুসলিম

৬. মুসান্নাফ ইবনু আব্দুর রাযযাক ও মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ

যে দ্বীন, যে ইসলামের ব্যাপারে আমাকে আর আপনাকে প্রশ্ন করা হবে, সেই দ্বীনের অন্যতম বুনিয়াদ হলো নামায, কালিমায়ে শাহাদাতের পর যার স্থান, যেই নামায ত্যাগ করলে ইসলামের কোনো অংশই আর বাকী থাকে না, সে নামাযকে পরিত্যাগ করার পর আর কোন অংশ নিয়ে কবরে যাবেন আপনি? নামায ত্যাগ করার পর আর কোন বুনিয়াদকে শক্তভাবে ধরলে পরে আপনার দ্বীন ঠিক থাকবে বলতে পারেন? এত গুরুত্বপূর্ণ অংশকে ছেড়ে দেওয়ার পরেও কি করে ভাবা যায় যে কবরে ফেরেশতাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন আপনি? ভেবে দেখুন!

তৃতীয় প্রশ্নের দিকে আসুন। ফেরেশতারা তিন নাম্বারে প্রশ্ন করবেন 'তোমার কাছে যাকে পাঠানো হয়েছিলো তাঁর ব্যাপারে তোমার কি মত?' এখানে রাসুলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বোঝানো হচ্ছে। ভাবছেন পটাপট বলে দেবেন, তিনি আমার রাসূল ও নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। কিন্তু না! আগেই বলেছি সেদিন মুখস্থবিদ্যা কোনো কাজে আসবে না, যদি না আপনার আমল সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মত যথেষ্ট না হয়। সেদিন আপনি ইচ্ছা করলেও তাঁকে নিজের নবী ও রাসূল হিসেবে পরিচয় দিতে পারবেন না। কিভাবে জবাব দেবেন আপনি? কতশত দিন আপনি রাসূলের আনা নামাযের মত এতবড় ফরয বিধানকে অবহেলা করেছেন? আল্লাহ তা'আলা কোনো ইবাদাতই রাসূলকে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে ফরয করেননি, একমাত্র নামায বাদে। যেই নামাযের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এত গুরত্বারোপ সেই ইবাদাতের ক্ষেত্রেই আপনার এত এত সংকীর্ণতা? রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্য সবচেয়ে বড় প্রশান্তির বিষয় ছিলো নামায। কেননা তিনি বলেছেন,

وجُعِلَتْ قُرَّةُ عيني في الصلاة

"আমার চোখের প্রশান্তি রাখা হয়েছে নামাযে" [৭]

আর আপনি সেই নামাযকেই ক্রমাগত অবহেলা করে চলেছেন? তাহলে কীভাবে

---

৭. মুসনাদে ইমাম আহমাদ, সনদ হাসান

সেই রাসূলের রিসালাতের সাক্ষ্য দেবেন ভয়াল কবরে, বলতে পারেন? কীভাবে সেদিন আপনি তাঁর শাফায়াতের যোগ্য হবেন, যেদিন সকলেই আপনার আমার পক্ষে শাফায়াত করতে অস্বীকার করবেন? এমনকি বড় বড় নবীরাও শাফায়াত করতে ভয় পাবেন, শঙ্কিত থাকবেন নিজের ব্যাপারে। প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারেই চিন্তা করতে থাকবে, 'ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী' 'আমার কি হবে, আমার কি হবে' বলতে থাকবে, গোটা মানবজাতি থাকবে ভীষণ উদ্বিগ্ন। যেদিন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মাতকে চিনে চিনে হাউযে কাউসার থেকে পানি পান করাবেন, সেদিন কি হবে জানেন? জানেন এত এত মানুষ থেকে তিনি কীভাবে তাঁর উম্মাতকে চিনে নেবেন? রাসুলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো,

كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

"আপনি কীভাবে আপনার পরে আসা আপনার উম্মাতকে চিনবেন?"

তিনি উত্তরে বলেন,

"অনেকগুলো কালো ঘোড়ার মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তির একটি কপালচিত্রা ঘোড়া থাকে তবে কি সে উক্ত ঘোড়াকে চিনতে পারবে না?" তাঁরা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই পারবে।" তখন তিনি বলেন,

فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ

"তাঁরা (আমার উম্মাত) ওযুর প্রভাবে জ্যোতির্ময় চেহারা ও হাত-পা নিয়ে উপস্থিত হবে। আর আমি আগেই হাউযে কাওসারের কিনারে উপস্থিত থাকবো।" [৮]

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মাতকে ওযুর চিহ্ন দেখে দেখে চিনে নেবেন, পানি পান করাবেন হাউযে কাওসার থেকে। যে কিনা

৮. সহীহ মুসলিম

সারাজীবনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যাপারে যত্নবান ছিলো না তাকে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কীভাবে চিনে নেবেন? কীভাবেই-বা পানি পান করাবেন? দুনিয়ার জীবনে যার নামাযের হিসাব ছিলো না, তার তো ওযুও ছিলো না। যার ওযু নেই তবে ওযুর কারণে তার হাত-পা আলোকময় কীভাবে হবে? আর কীভাবেই-বা তাকে নিজের উম্মাত হিসেবে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গণ্য করবেন? আর কীভাবেই-বা আপনি সেই ব্যক্তিকে কবরে নিজের রাসূল হিসেবে চিনে নিবেন? একটুও ভেবে দেখবেন না? একটু ভেবে দেখুন! আপনি কতদিন, কতবার Muhammad (Sm) is the best human being forever লিখে পোস্ট শেয়ার দিয়েছেন তা সেদিন কোনো কাজেই আসবে না, যদি না আপনি সত্যিই রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখানো পথে না চলেন, নামায না পড়েন, তাঁকে নিজের জীবনে একমাত্র পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিয়ে সেভাবেই জীবন পরিচালনা না করেন।

কিন্তু নামায পড়তে কষ্ট লাগে যে!

চিন্তা করে দেখুন! আপনি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। অসহ্য গরম। চারিদিকে অজস্র, না, অজস্র নয়; বরং কোটি কোটি, বিলিয়ন বিলিয়ন, ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন মানুষ। তিল পা রাখার জায়গাও কোথাও নেই। অনেকেই ঘামের সাগরে ডুবে আছে। নিজের মন্দ আমলের অনুপাতে কেউ ঘামের পা পর্যন্ত, কেউ নাক পর্যন্ত, কেউ গলা পর্যন্ত, কেউ হাঁটু পর্যন্ত সেই সাগরে ডুবে আছে। দীর্ঘক্ষণ পরে হিসাব-নিকাশের পর্ব শুরু হলো। আজ হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। পুরো জীবনের হিসাব-নিকাশ দেয়া লাগবে আপনাকে আজ। আমাকে একঘণ্টা কাজের পাই টু পাই হিসাব দিতে বলা হলেই পারবো না। খুব সম্ভব আপনিও পারবেন না। হয়ত পারবেন। কিন্তু পুরো জীবনের হিসাব-নিকাশ? ৬০, ৭০, ৮০, ৯০ বছরের দীর্ঘ জীবনের প্রতিটি সেকেন্ডের হিসাব-নিকাশ দিতে গেলে কি তা সম্ভব হবে আসলেই? যদি সত্যিই এত দীর্ঘ জীবনের সেকেন্ড-সেকেন্ডের সেই হিসাব নিকাশকে একত্র করে একটি বই আকারে দেওয়া হয়, তবে তার ফলাফল কি খুব একটা সুখকর হবে বলে মনে হয়? কত কাজই আমি আপনি করে বেড়াচ্ছি। সব কাজের হিসাব নিলে তো অবস্থা খুব বেগতিক হয়ে যাবে। আপনি নিজেই পুরো এক সপ্তাহ নিজের কাজের হিসাব রাখুন না! দেখবেন, এ তো ভয়ানক কঠিন কাজ। কিন্তু, আমার আপনার হিসাব কিন্তু রাখছে একদল অতি অভিজ্ঞ আর দক্ষ ফেরেশতা। তাঁরা হিসাব লিখতে মোটেও ভুল করেন না। তাদের হিসাবের নৈপুণ্য বড়ই মারাত্মক। আর সেসকল ফেরেশতাদের গণনাকৃত হিসাবই কিন্তু আমাদের সামনে পেশ করা হবে। এ রকমটাই হবে কিয়ামতের দিনে। নিশ্চিতভাবেই হবে। অবশ্যই হবে। আর সেদিনের হিসাবের সূক্ষ্মতা দেখে কেউ কেউ বলে উঠবে,

يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا

"হায় দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন বই? ওটা তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না এবং সমস্ত হিসাব রেখেছে।" [৯]

কিন্তু ভয় নেই, কেননা মুমিন বান্দাদের জন্য আছে সুসংবাদ। কেননা রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ

"নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন বান্দার আমল থেকে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে, যদি নামাযের হিসাব ঠিকঠাক থাকে তবে সে মুক্তি ও নাযাত পাবে, আর যদি নামাযের হিসাব ঠিক না থাকে তবে সে ধ্বংস হবে, হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" [১০]

আপনি অফিসে বাসে করে গিয়েছিলেন কি ট্রেনে করে, বাস কত দেরি করে এসেছিলো, ট্রেনে কয়ঘন্টা বিলম্ব হয়েছিলো, আপনি অফিসে অনেক ব্যস্ত থাকতেন কি না, অফিসে লাঞ্চের টাইম দিত কি দিত না, আপনার কোচিংয়ে পড়ালেখার জন্য কেমন চাপ দিত, আপনার কলেজের রেজাল্টের গ্রেড কেমন, আপনার ভার্সিটিতে এসাইনমেন্ট ছিলো কি ছিলো না, আপনার সামনে এক্সাম ছিলো কি না, আপনার এক্সামের প্রিপারেশান কতটুকু ছিলো বা আসলেই ছিলো কি না, আপনার দোকানের লোকসান হলো না লাভ, আপনার গার্লফ্রেন্ড একটা ছিলো কি দুটো, তার সাথে কতক্ষণ কথা বলতেন, আপনি কোন ব্র্যান্ডের জামা আর জুতা পরেছেন, নতুন কেনা জামাটায় আপনাকে বিশ্বসুন্দরী লাগছিলো কি না, আপনি সামস্যাং না এলজির মোবাইল ব্যবহার করতেন, কোন ব্র্যান্ডের গ্যাজেট ইউজ করতেন, আপনার গ্যাজেটের চয়েজ দেখে আপনার বন্ধুরা বাহ বাহ করত কি করত না, আপনার ল্যাপটপ অ্যাপেলের নাকি উইন্ডোজের, আপনি কোন বসের আন্ডারে চাকরি করতেন, সেই বস রাগী ছিলো কি ছিলো না, আপনি বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় কয়টা ফ্ল্যাটের মালিক, অমুক অমুক প্লট প্রকল্পে আপনার কয়শ বিঘা জমি ছিলো, আপনার বাপ-দাদা কয় হাজার একর জমি

---

৯. সূরা কাহাফ, ৪৯

১০. তিরমিযী, সনদ সহীহ

আপনাদের জন্য রেখে গেছেন, আপনার বাপ-দাদাকে পৃথিবীর সবাই চিনত কি চিনত না, আপনি কে তা কি দুনিয়ার সকলে জানত কি জানত না; এসবের মোহে পড়েই তো আপনি নামাযের সময় করে উঠতে পারছেন না, তাই তো? জেনে রাখুন, আল্লাহ আপনাকে কিয়ামত দিবসে এসবের কিছুই জিজ্ঞেস করবেন না। আপনাকে আল্লাহর হকের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের কথা জিজ্ঞাসা করা হবে। যেই নামায দুনিয়ার জীবনে শিরক-কুফর আর ঈমানের মাঝে পার্থক্যকারী ছিলো, সেই নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, সর্বপ্রথম জিজ্ঞেস করা হবে।

ভেবে দেখুন সেই ভয়ার্ত দিনের কথা। কিয়ামত দিবসের কথা। এটি এমন এক দিন, যখন আপনার আদরিনী স্ত্রী আপনাকে দেখলে পালাবে, দুনিয়ার জীবনে বটবৃক্ষের ছায়ার মত থাকা মা-বাবাও আপনার থেকে পালিয়ে যাবে, পলায়ন করবে। যেদিন ভাই-বোন একে অপর থেকে দূরে সরে যাবে; গার্লফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ড, জাস্টফ্রেন্ড, এদের টিকিটা পর্যন্তও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সবাই যার যার অবস্থা নিয়ে ব্যস্ত ও ত্রস্ত-তটস্থ থাকবে। নিজ নিজ হালত নিয়েই সবাই ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকবে।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٤٣) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٥٣) وَصَاحِبَتِهِ
وَبَنِيهِ (٦٣) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٧٣)

সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার নিজের ভাই থেকে এবং তার মাতা, তার পিতা, তার স্ত্রী ও তার সন্তান থেকে। তাদের প্রত্যেকের সেদিন এমন অবস্থা হবে যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে। [১১]

এরাই তো তারা, যাদের জন্য আপনি দিনের পর দিন নামায ত্যাগ করে এসেছেন। সেদিন আপনার সঙ্গ ত্যাগ করবে সেসব বন্ধুরাও যাদের সঙ্গ দেয়ার জন্য আপনি বছরের পর বছর আযান শুনেও না শোনার ভঙ্গি করে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছেন। এরাই সেই বন্ধু যারা আপনাকে নামাযের জন্য উঠতে দেয়নি। নামাযের জন্য উঠতে দেখলে আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে। সেদিন যাদের ছাড়া লাইফ ইমপসিবল মনে করতেন সেই বন্ধুরাই হয়ে উঠবে আপনার ঘোরতর শত্রু। কী বিশ্বাস হচ্ছে না?

---

১১. আবাসা, ৩৪-৩৭

الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ

সেদিন বন্ধুগণ একে অপরের জন্য হয়ে উঠবে শত্রু, মুত্তাকীরা বাদে। [১২]

আপনার দামি মোবাইল ফোন, যার নানামুখী ফিচারে বুঁদ হয়েছিলেন বিধায় নামাযের সময় করে উঠতে পারেননি, সেই মোবাইলের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যাবে। আপনার পড়ালেখা আর এক্সামও যে কোন দিক দিয়ে পালাবে আপনি টেরও পাবেন না, যেই এক্সাম আর পড়ালেখার দোহাই দিয়ে দিয়ে শত শত দিন আপনি নামায ছেড়েছেন। কোথায় হারিয়ে যাবে আপনার শাড়ি-গয়না-কানের দুল আর নাকের ফুল নিয়ে ভাবিদের সাথে রকমারী আড্ডা আর গল্পগুজব, তা আপনি বুঝতেই পারবেন না। হারিয়ে যাবে এত এত মানুষের ঢল। সেদিন এই দুনিয়ার অস্তিত্বই হবে ভিন্ন। এত সুন্দর দুনিয়া হয়ে যাবে এক সমতল ভূমি। যেখানে থাকবে শুধু মানুষ আর মানুষ। যারা তাদের সারা জীবনের আমল নিয়ে হাজির হয়েছে আল্লাহর দরবারে। হিসাব দেয়ার জন্য। একেবারে একা। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায়। কেউ তার সাহায্যকারী হতে রাজি হবে না। কেউ তার কাঁধে হাত বুলিয়ে আশ্বস্তও করবে না।

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً

প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিন একাকী আসবে। [১৩]

সেদিনের জন্য কি তৈরি করছেন আপনি? কমপক্ষে ঈমানের পাথেয় সংগ্রহ করেছেন তো? ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম আমল নামাযের হিসাবটা দেয়ার জন্য নামাযগুলো ঠিকঠাক পড়েছেন তো? যে নামায পড়েনি তার জন্য তাহলে কি অপেক্ষা করছে তা কি বুঝে নেয়া দরকার না? কেননা মনে রাখতে হবে মুমিনদের থেকে কিন্তু সম্পূর্ণ হিসাব নেয়া হবে না, তাদের কেবলমাত্র হিসাবের মুখোমুখি করা হবে। আর এই কারণে নামাযের হিসাবই আগেভাগে নিয়ে নেওয়া হবে। কারণ মুমিনমাত্রই নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার কথা। কমপক্ষে নামাযের হিসাব ঠিকঠাক সকল মুমিনেরই থাকার কথা। আর এই হিসাব ঠিকঠাক থাকলেই আল্লাহর রহমতে অন্যান্য হিসাব সহজ হয়ে যাবে।

---

১২. সূরা যুখরুফ, ৬৭

১৩. সূরা মারঈয়াম, ৯৪

وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف

"যে নামাযের রক্ষণাবেক্ষণকারী হবে না তার জন্য কোনো নূর, কোনো প্রমাণ আর কোনো রক্ষাকারী থাকবে না; আর সে কিয়ামতের দিন কারুন, ফিরআউন, উবাই ইবনু খালাফের সঙ্গী হবে।" [১৬]

পিলে চমকে গেছে? এখনো চমকায়নি? শুনুন তবে। মনে করুন পুলসিরাত বা সিরাতের ব্রিজ স্থাপন করা হয়েছে। চারিদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। কালি গোলানো কালোর চাইতেও বেশি কালো মনে হচ্ছে চারিদিকে। কারণ, সিরাতের চারপাশে থাকবে না কোনো আলো। সেদিন থাকবে কেবল আঁধার আর আঁধার। তার ওপর আবার এই ব্রিজ এক মরণ সাঁকো। সেই ব্রিজ হবে চুলের চাইতেও চিকন আর তলোয়ারের চাইতেও ধারালো। এর আশেপাশে থাকবে অসংখ্য কাঁটা। যার যার আমলের দুর্বলতা অনুযায়ী সেই কাঁটাগুলো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করবে প্রত্যেকেই। সেদিন প্রত্যেকের মুখে কেবল একটা কথাই থাকবে, 'আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম! আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম!' 'হে আল্লাহ নিরাপত্তা দিন! হে আল্লাহ নিরাপত্তা দিন!' আল্লাহর রহমতে সেদিন নেককাররা প্রত্যেকেই যার যার আমল অনুযায়ী নূর পাবে। যেই আমল তারা পৃথিবীর জীবনে করে এসেছে, সবরের সাথে, নিরবচ্ছিনতার সাথে। কারো নূর হবে পাহাড় পরিমাণ, কারো হবে একটা মানুষ বরাবর, কারো আবার খেজুর গাছের সমপরিমাণ। কারো আবার অল্প একটু নূর থাকবে, এই জ্বলে এই আবার নিভে যায়। এভাবেই পথ চলতে হবে। কেউ এই মরণ সাঁকো পার হবে চোখের পলকে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ ঘোড়ার মত দ্রুত, কেউ বিদ্যুৎগতিতে আর কেউ অনেক কষ্টেসৃষ্টে। কিন্তু যাদের কাছে নূর থাকবে না? যারা এমন কারো সঙ্গীও হবে না যাদের আশেপাশে কারো নূর আছে? তাদের অবস্থাটা কি হবে ভাবা যায়? পাহাড় পরিমাণ নূর নিজের যেমন কাজে আসে, তেমনি আশেপাশে অন্যদেরও কাজে আসে। দুনিয়াতে তো এই কারণে ভালো নেককার সঙ্গীদের সাথে থাকার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া আছে। কিন্তু তার কি হবে যার নিজের কাছে যেমন নূর নেই, তেমনি তার আশেপাশে সঙ্গীদের কাছেও কোনো নূর নেই, থাকবেই-বা কিভাবে, কেননা তার সঙ্গী ফিরআউন, কারুন আর উবাই ইবনু খালাফ। তাদের অবস্থা কি ভয়াবহ হবে চিন্তা করতে পারছেন?

---

১৬. মুসনাদে আহমাদ, সনদ জাইয়্যিদ

নামাযকে অবহেলা করে কি নিজেই সেই ভয়াবহতার দিকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাচ্ছেন না? নিজেই কি আমল দিয়ে ফিরআউন, কারুন আর উবাইদের মত নিকৃষ্ট কাফিরদের সাদৃশ্য করছেন না? করছেন কি? করবেন না, মোটেও করবেন না।

যে দুনিয়ার পিছনে আপনি জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে দিচ্ছেন, নিজের মূল্যবান সময়কে করছেন নষ্ট, আপনার আখেরাতের সবচেয়ে বড় পাথেয় ঈমান ও নামাযকে করছেন অবহেলা; সেই দুনিয়া তো আপনাকে সেই বিপদের দিনে রক্ষা করতে পারবে না। পারবে না এক চিলতে আলোর মশাল জ্বালতে, পারবে না আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদের কাঠগড়ায় প্রশ্নের উত্তর দেয়াতে, পারবে না মিযানে নেকীর পাল্লা ভারী করতে, পারবে না পুলসিরাতের ব্রিজে একটুখানি আলো দিতে, না পারবে আপনাকে দ্রুত পুলসিরাত পার করাতে; তাহলে কি সেই দুনিয়ার জন্য নিজের মূল্যবান সম্পদ নষ্ট করার মত বোকামিতে লিপ্ত আছেন আপনি? কি অদ্ভুত, তাই না?

রাগ করবেন না প্লিজ! আপনাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করার ইচ্ছে আমার একদমই নেই। আর আপনাকে আক্রমণ করে, মোটা মোটা কথা বলে আমার হবেটাই-বা কি? কিন্তু বাস্তবতা বোঝাটাও জরুরি, আমার ও আপনার, প্রত্যেকের জন্যই ভীষণ দরকারি। এবার একটু একাকী ভেবে দেখুন! যে দিনটি আমাদের প্রত্যেকের জন্যই অপেক্ষা করছে সেই দিনের ভয়াবহতা থেকে বাঁচা বেশি জরুরি, নাকি সেই ভয়াবহতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সকল সময় দুনিয়ার পেছনে দেওয়াটা জরুরি? ঈমান ও ঈমানের একেবারেই মৌলিক দাবি নামাযটা পড়ে ঈমানটার হেফাজত করা বেশি দরকারি; নাকি অফিস, বাড়ি-গাড়ি, পড়ালেখা, গ্যাজেট, জামা-কাপড়-বিউটি প্রোডাক্টসে মুখ গুঁজে রেখে ঈমান ও নামাযকে অবহেলা করে নূন্যতম ঈমানটুকু খুইয়ে ফেলা অধিক দরকারি? সেদিনের পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য আমলে নামাযের চিহ্ন রাখা জরুরী নাকি নামায ত্যাগের? সেদিন আপনি কি মুখে ওযুর প্রভাবে এতটুকু আলো চান না যে আলোতে আপনার নবী আপনাকে চিনে নিতে পারেন? নাকি পুলসিরাতের ব্রিজের আলো থেকে পুঁজিবাদী দুনিয়ার লাইট-ক্যামেরার আলো বেশি পছন্দনীয় হয়ে গেলো আপনার কাছে? পুলসিরাতের ব্রিজ পার হওয়া আগে নাকি এক্সামের ব্রিজ পার হওয়া আগে? কোনটা? ভেবে দেখুন!

এই নশ্বর দুনিয়ার পেছনেই সারা সময় ক্ষয় করছেন আপনি? যেকোনো সময় সাজানো গোছানো জীবনে মৃত্যু নাকের সামনে চলে আসতে পারে সেই জীবনের জন্যই দামি সময়গুলো নষ্ট করছেন? যেখানে সম্পদের পাহাড় গড়লেও নেই সম্পদ ভোগের গ্যারান্টি, সেই জিন্দেগীর চাকা সচল রাখার জন্যই কি সকল সময় বিলিয়ে দিচ্ছেন আপনি? হাতেগোনা কিছুদিন একটু ভালো থাকার জন্য দুনিয়া ঘুরে অফিস করতে পারেন, একটু সিকিউরড লাইফ আর একটা ভালো চাকরির আশায় পুরো রাত জেগে বিসিএসের পড়া পড়তে পারেন, পড়া মুখস্থ করার জন্য রাত জেগে জেগে চোখের নিচের অংশ কালো বানিয়ে ফেলতে পারেন, গান শেখার জন্য ভোরে পাখিদের ওঠার আগেই রেওয়াজ শুরু করতে পারেন, অফিসে দেরী হওয়ার ভয়ে ফজরের আগেই অফিসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে পারেন, এক্সামে ভালো সিজিপিএ আর হাইয়ার গ্রেডের জন্য কফি খেয়ে টলতে টলতে পড়া রিভাইজ করতে পারেন, গণিতের ভালোবাসায় এক সমস্যা নিয়ে দিনের পর দিন পড়ে থাকতে পারেন, IELTS এ ৭.৫+ পাওয়ার জন্য প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা ইংলিশ প্র্যাক্টিস করতে পারেন; তবে কি কবরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার জন্য আপনি ঈমানের নূন্যতম দাবীও পূরণ করতে পারেন না? ৫০ হাজার বছরের সমতুল্য কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য নামাযটা পড়তে পারেন না? দুঃস্বপ্ন থেকেও ভয়ানক পুলসিরাতের মরণব্রিজ পার হওয়ার জন্য নামাযের নূর সংগ্রহ করতে পারেন না?

এরপরেও নামাযের (আপাত) কষ্টগুলো আপনার কাছে কষ্ট মনে হচ্ছে? তাহলে আপনি অন্য সব জায়গায় এত কষ্ট আর পরিশ্রম কিভাবে সহ্য করছেন? তাহলে ইহজগতের প্রতিই কি আপনার বিশ্বাস বেশি? আপনি কি বিশ্বাস করেন না একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে? বিশ্বাস করেন না যে জিজ্ঞাসিত হতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষণের জন্য? কিন্তু সেই দিন তো আসছে, হ্যাঁ, আসছে, আসবেই। কোনো সন্দেহ নেই সেই দিনের আগমনের ব্যাপারে। আমি জানি, আপনি আখিরাতে বিশ্বাস রাখেন। আমি জানি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারেও আপনার ঈমান আছে। তবে ভাই ও বোন আমার! নিজের ভালোর জন্যই দুনিয়া আর আখিরাতের তুলনা করে দেখুন, আপনার সাধারণ বিবেক কি বলে? কোনটা বেশি গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য? একবার ভেবে দেখুনই না! নিজের ভালো নাকি পাগলেও বোঝে, আর আল্লাহ তো আপনাকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন, তো তাকে কাজে লাগান! মাথা খাটান! উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন!

ভাইয়া! আমি সবই বুঝি!

দেখেন ভাইয়া, আমি কিন্তু সবই জানি, সবই বুঝি, কিন্তু পরে পড়বো! যখন শুরু করবো তখন একবারে শুরু করবো! খুব চিত্তাকর্ষক! বাহানা বটে। কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে একেবারেই বাজে যুক্তি। আসলে এটা যুক্তির কাতারেও পড়ে না, পড়ে কুযুক্তির কাতারে। সিএ একবার পড়ে শেষ করতে পারলেই আশি হাজার স্যালারি মিনিমাম, শুনেই তো দৌড় দেন সিএ পড়তে, তখন তো বলেন না যে, আমি সবই বুঝি, আর কিছুদিন ঘুমাই, কিছুদিন মৌজমাস্তি করে তারপর আস্তে ধীরে নাহয় সিএ পড়া যাবে। বিসিএস পাস করে চাকুরী পেলেই লাইফ সেটেলড, এই কারণেই তো প্রতি বছর গরু খাটা খেটে লাখ লাখ লোক বিসিএস দিচ্ছে, তাদের কয়জনে ভাবে যে, আমি সবই বুঝি! কিন্তু এখন এত কষ্ট করবো কেন, পরে সময় সুযোগ বুঝে বিসিএস দেওয়া যাবে। সামনে আগুন দেখতে পেয়েও আমি সবই বুঝি বলে আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার মত বোকা কয়জন আছে? চলার পথে বিরাট গর্ত দেখতে পেয়েও সবই বুঝি বলে গর্তের দিকে হেঁটে যাওয়ার মত লোকও আছে নাকি এ জগতে? ডাকাতদের এলাকায় সবই বুঝি বলে গায়ে পড়ে বীরত্ব দেখানোর মত লোকও আছে এই কথা বিশ্বাস করতে বলছেন? দুনিয়ার ফায়দা বোঝার পরেও কে সেদিকে যায়না, আর বিপদ জানার পরেও যায় কোনজনা? সেখানে কি 'আমি সবই বুঝি' বলে বিলম্ব করে কেউ? সেখানে 'আমি সবই বুঝি'র বয়ান দেওয়া হয়না কেন? 'আমি বুঝি'র যত খুতবা সব নামাযের ক্ষেত্রেই কেন?

আসলেই বিশ্বাস করি তো?

এতক্ষণ যে কবর, হাশর, নাশর, পুনরুত্থান, পুলসিরাত নিয়ে কথা বলা হচ্ছিলো সেগুলোর ব্যাপারে আসলে আমাদের অবস্থান কেমন? আমি-আপনি-আমরা আসলেই বিশ্বাস করি তো এসবে? নাকি এগুলোকে পুরোনো যুগের গল্প মনে হয়? নামাযসহ আল্লাহর যাবতীয় বিধিবিধান মানার ক্ষেত্রে আমাদের যে অসততা নজরে আসে তার কারণটা কি তবে দুনিয়ার নগদের প্রতি বিশ্বাস আর আখিরাতের বাকির প্রতি অবিশ্বাস? নাকি আখিরাতের প্রতি দুর্বল বিশ্বাস? দুনিয়া চোখের সামনে আছে তাই বিশ্বাস করতে সহজ, আর আখিরাত চোখের বাহিরে বলে এত সহজে বিশ্বাস করা যায় না, এই কি ব্যাপার তবে? ঈমানের মৌলিক অঙ্গই হলো আখিরাতের প্রতি ঈমান। গোটা কুরআনের ৬২৩৬টি আয়াতের কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশই আখিরাত নিয়ে। বলা যায় গোটা ঈমানের পিলারটি দাঁড়িয়েই আছে আখিরাতের মাটির ওপর। এই কারণেই কুরআন খুললে আমরা কিছুক্ষণ পর পরই দেখবো আখিরাত সম্পর্কে সতর্ক করা হচ্ছে, নিয়ামতের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আযাবের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, আল্লাহ আখিরাত ও আখিরাতের সীমাহীন দুনিয়াকে মানুষের চর্মচক্ষুর সীমানার বাইরে রেখেছেন। কারণ, এটাই পরীক্ষা। কিন্তু আখিরাতে বিশ্বাসের মত অজস্র প্রমাণও চোখের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন। ক্ষুদ্র শুক্র থেকে মানুষের জন্ম, তারপর এই মানুষের তেজোদীপ্ত যৌবন এরপর আবার বার্ধক্যে নুইয়ে পড়া, শেষমেষ কবরের মাটিতে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, বৃষ্টির পানিতে মৃত উদ্ভিদের প্রাণ ফিরে পাওয়া, এই বিশাল সৃষ্টিকর্ম, এদের সুনিপুণ কলাকৌশল, কোন জিনিসে আখিরাতের প্রমাণ পাওয়া যায় না বলুন তো! কত অপরাধী লক্ষ মানুষ মেরে পার পেয়ে যাচ্ছে। কখনো-বা শাস্তি পাচ্ছে, তবে শাস্তি পেলেই-বা কি, একটা মানুষকে খুনের শাস্তি ফাঁসি বা মৃত্যুদণ্ড আর লাখো-কোটি মানুষকে জ্যান্ত মেরে

ফেলার শাস্তিও ওই একই। প্রকৃত সাম্য আর ন্যায্যবিচার কোথায় গেলো বলুন তো? কত নিরপরাধ বিচারাভাবে মারা যাচ্ছে, কত যুলুমকারী প্রতিনিয়ত যুলুমের বোঝা বাড়িয়ে চলেছে, কত মহাজন সুদের টাকায় আঙুল ফুলে হচ্ছে কলাগাছ, বলুন তো এগুলোর কয়টার বিচার দুনিয়ার জীবনে হচ্ছে, হয়ে থাকে? হলেও তা কি অপরাধের সমানুপাতিক ন্যায্য হয়? হতে পারে? আসলে না, হতে পারে না, হয়ও না। এই কারণেই তো আখিরাত আছে। আখিরাত থাকতেই হবে। এই ধোঁকার জীবনের ওইপাশটায় আছে আরেকটা জীবন। আজকের জবাবদিহিতাশূন্য জীবনের মায়াবী জীবনের পর্দাটা সরলেই শুরু হবে জবাবদিহির আখিরাত। সেদিন হবে মহাবিচার, সেখানকার বিচারক হবেন আল্লাহ আযযা ওয়াজাল, যিনি চুল-পরিমাণও যুলুম করেন না, যিনি পরম দয়াময়, চরম ক্ষমাশীল, প্রবল পরাক্রমশালী, তিনি একটুও পরোয়া করেন না কারো, যিনি চিরবিজয়ী।

আমাদের আশা-আকাঙ্খা আকাশের সমান বিশাল হলেও জীবনটা আশার তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্র। যদি এই জীবনটাই শেষ হত, তবে অবশ্যই আমাদের এই আশা-আকাঙ্খার সমান এই জীবনটা আরও বড় আর বিস্তৃত হত। এখানেও আছে আখিরাতের প্রমাণ। কেননা আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির সময় তার ডিজাইনই করেছেন জান্নাতের অসীমতার জন্য। কিন্তু সীমিত সময়ের দুনিয়ার জিন্দানখানায় রেখেছেন, পরীক্ষার জন্য। মানুষ আসলে তো জান্নাতের জন্যই সৃষ্ট। তাই তার আশাও জান্নাতের মতই অসীম। কিন্তু এই অসীমকেই আসতে হয়েছে সীমিতের মাঝে। এতে আছে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন। আখিরাতের স্মরণিকা। মানুষের মাঝে আল্লাহ আখিরাতের প্রেরণা সৃষ্টিগত প্রকৃতিতেই সেট করে দিয়েছেন। এই কারণে তাকে যখনই আখিরাতের কথা, তার পুরস্কারের কথা শোনানো হয় তখন সে তার প্রতি আগ্রহান্বিত হয়, যখন তার আযাবের কথা জানানো হয় তখন সে ভীত হয়। এসব কথা বলে তাকে যেভাবে আন্দোলিত করা যায় আর কোনো কিছু দিয়েই তাকে সেভাবে আন্দোলিত করা যায় না। কেন? বলতে পারেন? এটাকে সেক্যুলার ও বস্তুবাদীরা মানুষের দুর্বলতা, কুসংস্কার, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানুষের মাঝে থেকে যাওয়া অসম্পূর্ণতাসহ নানা গোঁজামিল দিয়ে ব্যাখ্যা করলেও এটা আসলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিজনিত সীমাবদ্ধতা। এটা মানুষের মাঝে স্বাভাবিক আখিরাতের সুপ্ত চেতনার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা এটাই তার প্রকৃতি। তার ফিতরাত এ রকমই। আর তার প্রকৃতির অনুকূলে সে সহজাতভাবেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে মানিয়ে নেয়, বিচরণ করে।

ঈমানের কারণে মুমিন চোখে দেখা থেকে আল্লাহ ও রাসূলের কথার ওপর বেশি বিশ্বাস করে। তাই ভাই ও বোনেরা আমার! ভেবে দেখুন এবার! আপনি আসলেই আখিরাতে বিশ্বাস করেন তো? বিশ্বাস করলে আপনার সাথে আমার কথা আছে। আমি জানি, আপনি এবং আপনারাও আখিরাতে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই বিশ্বাসে হয়ত জং পড়ে আছে, ধুলোর আস্তরণ জমে আছে। সময় এসেছে ধুলো-ময়লা ধীরে ধীরে ঝাড়ুন, জং দূর করার চেষ্টা করুন। নিজের বিশ্বাসকে যাচাই করুন। কমপক্ষে দুনিয়ার বিশ্বাসের সাথে তুলনা করে দেখুন আপনার আখিরাতের বিশ্বাসকে। ভাই ও বোনেরা আমার! আল্লাহর কুরআনে কতশত আয়াত আর রাসূলের কতশত হাদীস আছে আখিরাতের ব্যাপারে তা কি ভুলে গেলেন আপনি? দুনিয়া যে আখিরাতের তুলনায় ধোঁকার সামগ্রী সেই আয়াত কি পড়া হয়নি? দুনিয়া যে নশ্বর তা কি বুঝে আসছে না? তাহলে কেন দুনিয়ার মত আখিরাতের ফায়দাকে বুঝি না আমরা? আখিরাতের কথা আসলেই বিলম্ব আর টালবাহানা, আর দুনিয়ার ফায়দা আসলে সবাইকে ঠেলেঠুলে আগে ছোটার প্রবণতা? এমনটা কেন? যদি আখিরাতের বিশ্বাসের পরেও এমনটা হয় তবে আমি বলবো, কারণটা আর কিছুই নয়, কারণটা আসলে নিজের সাথে অসততা, নিজের অস্তিত্বের সাথে প্রতারণা। নিজের আখিরাতের স্পষ্ট বিপদ বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পেরেও বিলম্ব করার বোকামি করা। এটা নিজেকে নিজে ধোঁকা দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

বয়স হলে নামায ধরবো!

আচ্ছা, নামাযের ব্যাপারে আপনাদের ধারণা কি? নামায খুব কঠিন জিনিস, হাড়হাড্ডি সব একাকার হয়ে যায়, হাঁপিয়ে যেতে হয়, এমন কিছু? এটা কি এক ধরণের ব্যায়াম, যাতে শারীরিক কসরত করতে হয়? কোনটা? আসল কথা হচ্ছে নামায খাবারের মত, খোরাকের মতন। খাবার খাওয়া যেমন সহজ কাজ তেমনি নামায পড়াও সহজ। খাবার আপনার আমার শরীরে পুষ্টির জোগান দেয়, শরীরকে সুস্থ রাখে, অন্তরকে রাখে সতেজ, শক্তি দেয় নফসকে, রুহকে রাখে বুলন্দ। নামাযও কিন্তু তেমনই। নামায আপনার ঈমানের খাবার। শরীরকে যেমন নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর খাবার দিয়ে সচল ও কর্মমুখর রাখতে হয়, তেমনি ঈমানের সচলতার জন্যও নামায একেবারেই আবশ্যিক। ইবাদাতের খাবার ছাড়া ঈমান অচল, আর ইবাদাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে নামায। ঈমান নামায ছাড়া পূর্ণতা পায় না। ঈমানের চাকাকে চলনসই রাখতে হলে অবশ্যই নামায পড়তে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। হতে পারে না। নামায না পড়া কিংবা নামাযে অবহেলা-গড়িমসি করা ঈমানহীনতা বা ঈমানী দুর্বলতার দিকেই ইশারা করে।

সঠিকভাবে নামায আদায় করা ঈমান থাকার দলীল। নামাযের মাধ্যমে আপনি পাঁচবার আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে প্রমাণ করেন যে, আপনি আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার উপর অটল আছেন, এর ওপরই চলতে চান আপনি। অন্তরের দৃঢ় ইচ্ছা আছে আপনি ঈমানের ওপরই টিকে থাকবেন। আপনি নামাযের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, আপনি কেবল তাঁরই গোলাম, আর কারো নন। ঘর-বাড়ি, কাজ-বাজ, অফিস-আদালত, পড়ালেখা-কোচিং-এক্সাম, স্বামী-সংসার সব ফেলে আল্লাহর কাছে তাঁর দরবারে হাজিরা দিতে ছুটে এসেছেন এই কারণেই, যাতে আপনি আল্লাহর সাথে করে আসা সেই ওয়াদাকে বারবার নবায়ন করে নিতে পারেন। কোন সে ওয়াদা যা আপনি করেছিলেন আল্লাহকে? সেই ওয়াদা হলো

আল্লাহকে রব বলে মেনে নেয়ার। একমাত্রই তাঁরই ইবাদাত করার, আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল বাতিল মা'বুদকে পরিত্যাগ করার। যে কারণে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। যে একটি বার্তা নিয়েই যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আমরা প্রত্যেক উম্মাতের কাছেই রাসূলকে প্রেরণ করেছি যাতে তাঁরা আল্লাহর ইবাদাত করে এবং তাগূত বর্জন করে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ[১৭]

"আমি সৃষ্টি করিনি জ্বিন ও মানুষকে কেবলমাত্র এই কারণ ছাড়া যে (তারা) আমার ইবাদাত করবে।" [১৮]

এই প্রতিশ্রুতি নবায়ন ও এর ওপর জীবন পরিচালনার জন্য নামাযের কোনো বিকল্প নেই। এ কারণেই নামায বিগত প্রতিটি নবী-রাসূলের উম্মাতের ওপরই ধার্য ছিলো। যে পাঁচবার আল্লাহর দরবারে হাজিরানা দেয় না তাঁর তো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যায়, ক্ষীণ হয়ে পড়ে ঈমানের শক্তি, আল্লাহ না করুন! একসময় ছিন্ন হয়ে যায় ঈমানের রজ্জু।

পুরো মানবজাতিকে যেই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য পূরণে বয়সের কথা কেন আসবে বলুন তো! শরীয়তমাফিক বালেগ হওয়ার পর থেকে নিয়ে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাকে এই উদ্দেশ্য পালন করতে হবে, এর ওপর অটল থাকতে হবে, এটা প্রত্যেকের জন্যই আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে ১৫ বছরের যুবক যা, ৬০ বছরের বৃদ্ধও তা, ২০ বছরের যুবতীর জন্য যেমন বিধান, ৭০ বছরের বৃদ্ধার জন্যও একই বিধান। বয়সের কথা এখানে আসলো ঠিক কোন কারণে?

আসলে সমস্যাটা কিন্তু অন্যখানে। আমরা নামাযকে নামাযের আসল রূপে

---

১৭. সূরা নাহল, ৩৬

১৮. সূরা যারিআত, ৫৬

উপলব্ধি করতে পারিনি। কেননা ইসলাম আমাদের কাছে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের মতই, আর তাই আমাদের কাছে নামাযটাও আর দশটা ধর্মের বিধানের মত স্রেফ একটা উপাসনা পদ্ধতি মাত্র, যা করলেও চলে, না করলেও সমস্যা নেই। উপাসনা করলে আপনি খুব ভালো মানুষ, কিন্তু তা না করলে যে আপনি খুব খারাপ, বাজে মানুষ—এমনটা বলা চলে না। কিন্তু ইসলাম আর সকল ধর্মের মত নয়, আর নামাযও স্রেফ আনুষ্ঠানিক কোনো উপাসনা নয়। নামায তো ইবাদাত। আর ইবাদাতই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। গোটা জীবনের সকল অংশে আল্লাহর দেয়া বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে একান্তচিত্তে আল্লাহর বিধান গ্রহণ করে নিয়ে, সেই মোতাবেক গোটা জীবন পরিচালনাই হচ্ছে ইবাদাত। আর ইবাদাতের গোটা স্পিরিট নামাযের মাধ্যমেই সবচাইতে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়। এই কারণেই নামায সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত। কারণ নামাযের প্রতিটি নড়াচড়াতেই আল্লাহর প্রতি বিশুদ্ধতম দাসত্বের ভঙ্গিমা ফুটে ওঠে। একদিক দিয়ে নামায স্বয়ংই ইবাদাত বরং সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত, আরেক দিক দিয়ে গোটা জীবনকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের শিক্ষায় উদ্ভাসিত করার বৃহত্তম প্রশিক্ষণ কোর্সও বটে। ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-ধুড়ো সবাই এখানে সমান। প্রত্যেকেই আল্লাহর দাস আর দাসী। আর দাস হিসেবে দাসত্ব অনিবার্য। সেই হিসেবে নামাযও আবশ্যক।

আর যৌবনের ইবাদাত আল্লাহর কাছে বেশি পছন্দের। কেননা তখনই ইবাদাতের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়। যৌবনে শরীরে থাকে শক্তি, অন্তর পূর্ণ থাকে হিম্মতে, নফস থাকে তাগড়া। এ সময়ে নফস গুনাহ করতে চায় কিন্তু যে যুবক নফসকে দমিয়ে ইবাদাতে নিমগ্ন হতে পারবে তাঁর মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক অনেক বেশি। একই কথা যুবতীর ক্ষেত্রেও। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পবিত্র জবানে বলেছেন

سَبْعَةٌ يُظِلُّهمْ اللهُ فِي ظِلِّه ، يَوْمَ لَا ظِلّ إِلّا ظِلُّه: وَشَابّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّه

সাত জনকে তাঁর (আল্লাহর) ছায়াতে আশ্রয় দেওয়া হবে, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে নাঃ সে যুবক যে আল্লাহর ইবাদাতে বেড়ে ওঠে।[১৯]

১৯. বুখারী

ভেবে দেখুন! আপনাকে কেউ গুপ্তধনের সন্ধান দিলো। একটা ঘরভর্তি গুপ্তধন। সেই খাজানা দেখলে চোখ মন জুড়িয়ে যায়। কিন্তু একটা সমস্যা, আপনাকে একটা সময়ের মাঝেই গুপ্তধন থেকে যা নেওয়ার তা নিয়ে নিতে হবে। তারপরে নিলে কিন্তু হবে না। অনেকটা ট্রেন ধরার মত, নির্ধারিত সময়ের আগে আসলে আপনি ট্রেন আরামসে ধরতে পারবেন, কিন্তু পরে আসলে কিন্তু আর ট্রেনটা ধরা হবে না। ঠিক তেমনি তারুণ্য, যৌবন এগুলো আল্লাহর তা'আলার অশেষ কৃপা, রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অনেক বড় নিয়ামত, বিশাল সম্পদের খাজানা, অফুরন্ত ধনভান্ডারের গুপ্তধন। সাইয়্যিদুল মুরসালীন বলেন,

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ

পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে মূল্যবান বস্তু মনে করোঃ
বার্ধক্যের পূর্বেই তোমার যৌবনকে। [২০]

আমরা যৌবনকালকেই হেলাফেলায় কাটিয়ে দেই, মামুলি মনে করে একে সঠিক মর্যাদা দেই না। কিন্তু যৌবন মোটেও সাদামাটা কিংবা সাধারণ জিনিস নয়। তা পুরোপুরি অসাধারণ, একেবারেই অনন্য। এ কারণে তাকে তার উপযুক্ত মূল্য দিতে হয়। নইলে তা চিরকালই একটা মায়া হয়ে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে যাবে এবং ব্যক্তিও তার পেছনে উন্মাদের মত আমৃত্যু ছুটতে থাকবে। অথচ অবশেষে এবং প্রতি মূহুর্তেই তাকে বিলাপ করতে হবে—যা চেয়েছি তা পাই না, যা পেয়েছি তা চাই না। যৌবনকালে আমরা যেসকল মায়ার পেছনে ছুটে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর ও প্রাণবন্ত অংশের সময়গুলো নষ্ট করছি একটু গভীরভাবে ভাবলেই তাদেরকে অনর্থক বলে মনে হবে। যৌবনের অসাধারণত্ব ও অতুলনীয়ত্ব তখনই বাস্তবে রূপ পাবে যখন এই সময়টাকে সত্য জানা, উপলব্ধি করা ও সত্যের জন্য বিসর্জন দেওয়া হবে। যৌবন তখনই সৌকর্যের উৎস হতে পারে যখন এই সময়টাকে আল্লাহর ইবাদাত ও ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করা হবে। এ কারণেই তো আল্লাহর কাছে যৌবনের ইবাদাত খুব প্রিয়।

যেই সময়ের ইবাদাত আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় সেই সময় দুনিয়াকে দিয়ে তারপর

---

২০. হাকিম

যখন হাতের বল কমে যাবে, কানে কম শোনা ধরবে, হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে যাবে, রিটায়ার করবেন; তখন দাড়ি ছেড়ে দিয়ে, দাড়ি মেহেদী দিয়ে রঙিন করে, সারাদিন তসবিহ টিপে দ্বীন মানতে চান? এটা কেমন দ্বীন হলো বলুন তো? সারাদিন দ্বীনের বাহিরে থেকে সন্ধ্যা পড়ার আগে হাত-মুখ ধুয়ে পাক্কা মুসল্লি? এই কি আমাদের দ্বীনের পরিচয়? তাহলে একটা কাজ করেন না! যুবক বয়সটা আল্লাহকে দেন, তারপর দুনিয়াকে বৃদ্ধ বয়সটা দেবেন! রাজি আছেন? হয়ত নেই। দুনিয়ার জন্য সর্বোত্তমটা রেখে তুলনামূলক কম উত্তমটা আল্লাহকে দিচ্ছেন? এই কি আমাদের ধার্মিকতা? এ রকম বিকলাঙ্গ দ্বীন মানা কি আমাদের উপকারে আসবে? এরকম দ্বীন মেনে কি কবরে পার হওয়া যাবে? আখিরাতে? পুলসিরাতে? না, একেবারেই যাবে না। আমি বলছি না যে, দীর্ঘ একটা সময়ে দ্বীনের ওপর আমল না করে শেষ বয়সে এসে অনুতপ্ত হয়ে দ্বীনের ওপর আমল করে, দ্বীনে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রবেশ করতে পারবেন না। অবশ্যই পারবেন। কিন্তু সমস্যাটা মানসিকতায়। বেশির ভাগ লোকেরই মানসিকতা হচ্ছে, আমি যুবক বয়সে দুনিয়া কামাবো, এটা ওটা করবো, এখন পর্দা করবো না, এখন ঈমান শিখবো না, এখন মিউজিক ছাড়বো না, ফ্রি-মিক্সিং ছাড়বো না; বয়স হলে দাড়ি রেখে ইব্রাহীম ইবনে আদহাম আর রাবেয়া বসরী হবো, মিউজিক ছেড়ে দেবো, পর্দা করবো আরও কত কি! অন্তরে এমন প্রতারণার ইচ্ছা রাখলে বয়স হলে দ্বীনের আমল করার ইচ্ছা রাখা তো জায়েজ নয়।

আসলে এই কথা বলার পেছনেও আছে আমাদের অসততা। আমরা নামাযের মর্মার্থ না বোঝার কারণে নামাযকে স্রেফ উপাসনা মনে করি, দুনিয়ার হাজার হাজার গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভিড়ে নামাযকে আমাদের কাছে একপ্রকার অপশনাল কিংবা অপ্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। তাই কেউ নামাযের কথা মনে করিয়ে দিলেই বাহানা দিয়ে বসি, 'আরে ভাই! এখন তো একটু এনজয় করার সময়, বয়স হলে নামায-কালাম ধরবো'। আমরা যে জীবনের উদ্দেশ্য থেকে কতদূরে আছি এই কথাগুলোই তার প্রমাণ।

আজকে আমার হাত, পা চোখ, মুখ সব ঠিকঠাক আছে তাই আমাদের আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের সঠিক উপলব্ধি হচ্ছে না। আজ যৌবনে আছি দেখে ধরাকে সরা জ্ঞান করছি। কে জানে, কালকে হয়ত এ সকল নিয়ামত আমার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। যৌবনের আগুন নিভে গেলেই শুরু হবে চামড়ায় ভাঁজ পড়া, কমে আসবে হৃদপিন্ডের ধাড়কান, কৃষ্ণকালো চুলে ধরবে পাক। আর মহা কিয়ামতের

দিন এ সকল নিয়ামতের হিসাব দিতে হবে, বুঝিয়ে দিতে হবে আল্লাহর দেওয়া আমানতকে কোন কাজে ব্যবহার করেছিলাম। সেদিন আল্লাহ যুবক আর বৃদ্ধের পরোয়া করবেন না। যে যতটুকু নিয়ামত পেয়েছে তাকে ততটুকু বুঝিয়ে দিতেই হবে। কোনো নিস্তার নেই।

আমরা যেন নিশ্চিত হয়েই আছি আমি বুড়ো বয়সটা পাবোই পাবো। কিন্তু বাসার পাশে কবরস্থানে কতশত যুবকের লাশ দাফন করা আছে তা কি ভুলে যাচ্ছেন? ভুলে যাচ্ছেন সেই দিনের কথা, যেদিন টগবগে এক যুবকের জানাযা পড়ে এসেছিলেন? মনে পড়ে না ত্রিশোর্ধ্ব সেই ছেলেটার কথা, যে মাকে বলেছিলো, 'মা আমি আসছি', ছেলে মায়ের কাছে ফিরেছিলো বটে, কিন্তু লাশ হয়ে! কীভাবে নিশ্চিত হলেন যে মৃত্যু আপনাকে বৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ দেবে? হঠাৎ করে একদিন সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে চমকে দেবে না আপনাকে, এর নিশ্চয়তা কে দিলো আপনাকে? বুড়ো বয়সটা আসার আগেই যদি মৃত্যু এসে হেঁচকা টান দিয়ে নিয়ে যায় চিরন্তনের পথে? তখন কেমন হবে? কিন্তু পথের পাথেয় যে একদম শূন্য। রাজি আছেন ব্যাগট্যাগ না গুছিয়েই ভ্রমণে বের হয়ে পড়তে? তাহলে বিনা পাথেয়তে আখিরাতের দীর্ঘ পথের সফর করতে রাজি কীভাবে হচ্ছেন? কিন্তু আমি জানি, একটু বুঝতে পারলে আপনিও বলবেন 'আমি রাজি নেই'। তাহলে বয়সের অযুহাত কেন দেওয়া? সত্য থেকে পালিয়ে বাঁচতে চান? পারবেন পালাতে? কি মনে হয়?

আমার অন্তর তো পরিষ্কার!

নামাযসহ অন্যান্য ইবাদাত থেকে বাঁচার জন্য একদল লোকের ছুঁড়ে দেয়া সেরা যুক্তি! বলা যায় এটাকে। আপনার অন্তর পরিষ্কার তো কি হয়েছে? আপনার জন্যই তো নামায। পরিষ্কার অন্তর নিয়ে নামায পড়বেন আর পরিষ্কার অন্তরকে আরও পরিষ্কার বানাবেন। হয়ে গেলো মামলা খতম! পরিষ্কার অন্তরকে আরও পরিষ্কার করা যাবে না এমন কথা কোথায় পেয়েছেন মশাই?

আসলে সবই অযুহাত। ইবাদাত থেকে বাঁচার বাহানা। আরাম করার ধান্ধা। যারা এ ধরণের কথা বলে তারা আসলে দ্বীন-শরীয়ত কি জিনিস তা সম্পর্কে একেবারেই ধারণা রাখেন না। ইবাদাত তো আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করে আল্লাহর দেওয়া বিধান বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া। আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা স্মরণ রেখে তাকে বারবার নবায়ন করতে থাকা। নফসকে আল্লাহর বিধান মানতে প্রতিনিয়ত বাধ্য করতে থাকা। নফসের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত থাকা। এভাবেই তো বান্দার অন্তর আস্তে আস্তে পবিত্র হতে থাকে। আলোকিত হতে থাকে ভেতরের রুহ। কারণ, রুহ তো ইবাদাতের মাধ্যমে নিজের প্রয়োজনীয় খোরাক প্রতিনিয়ত পাচ্ছে। দুনিয়াতে ইবাদাতের মাধ্যমে অন্তরকে পবিত্র করা আর জান্নাতের জন্য প্রস্তুত হতে থাকা, প্রস্তুত করতে থাকা, এটাই তো মানুষের মূল কাজ। যে তাতে সফল হলো সে তো ভাগ্যবান। সে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর এই সংগ্রামে অটল থাকবে, ইবাদাত করতে থাকবে, যতক্ষণ না মৃত্যু নামক জাজ্বল্যমান সত্য সামনে এসে পড়ে। অন্তর পবিত্র হয়ে গেছে ভালো কথা, এখন ইবাদাত থেকে হাত ধুয়ে ফেলার রীতি কোথা থেকে আমদানি করলেন মহোদয়? আরও ইবাদাত করুন, বেশি করে পবিত্র হোন।

তারা বলেঃ আসলে আমাদের ইবাদাত-টিবাদাত লাগে না, মন এমনিতেই পরিষ্কার থাকে। তাদের যুক্তি বিশ্বাস করলে এটাও বিশ্বাস করতে হবে যে, জীবনেও একবারও দাঁত পরিষ্কার না করেই দাঁত সাদা রাখা যায়, জীবনে না ধুয়েও কাপড় পরিষ্কার রাখা যায়। এবার বুঝুন তাহলে এদের যুক্তির জোর!

আল্লাহ তো ক্ষমাশীল!

কখনোই আল্লাহর অসীম ক্ষমাকে নিজের অক্ষমতা আর দুর্বলতার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবেন না। হ্যাঁ, আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, কোনো সন্দেহ নেই তাতে। তিনি ক্ষমা করেন, ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। তাঁর ক্ষমা ও রহমত তাঁর ক্রোধকে অতিক্রম করেছে। এর সবই ঠিক ও যথার্থ। কিন্তু আল্লাহ আর-রহমান হওয়ার পাশাপাশি আল-কাহহারও, আর-রহীম যদি তিনি হয়ে থাকেন, তবে সেই তিনিই আল-গালিব, গাফিরুয যাম্ব হলেও তিনি শাদিদুল ইকাবও, তিনি একদিক দিয়ে তাওবা কবুলকারী আরেকদিক দিয়ে কঠিন শাস্তিদানকারী। আল্লাহর রহমতের যোগ্য হলেই পরে রহমত পাওয়া যায়। এটা খুব ভালোমত বুঝে নিন। আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক কাজ যারা করে তাঁরাই আল্লাহর রহমত ও দয়া লাভে ধন্য হবে।

ভাই ও বোনেরা আমার! আল্লাহ ক্ষমাশীল বলে তাঁর ক্ষমা ও করুণাকে নিজের অপরাধের অজুহাত বানাবেন না। অফিসের বস ভালো হলে কি আপনি কাজকর্ম না করে খারাপ পারফরম্যান্স দেখান, বসের ভালো মানুষির সুযোগ নিয়ে তাকে ধোঁকা দেন? নাকি চেষ্টা করেন বসের কাছে নিজের ভালো থেকে ভালো পারফরম্যান্স দেখাতে, চেষ্টা করেন আরও বেশি করে বসের মনোঃপুত হতে? তাহলে নামাযের ক্ষেত্রে এসে আল্লাহর ক্ষমাকে এভাবে ব্যবহার করছেন কেন? আল্লাহকে কিন্তু এভাবে ধোঁকা দেওয়া যাবে না, শেষমেশ ধোঁকাটা নিজেকেই দেওয়া হবে।

আরও কিছু কথা

ভাই ও বোন আমার! ঈমান একমাত্র সম্পদ, যা ছাড়া দুনিয়া-আখিরাত উভয়ই বরবাদ। যদি দুনিয়ায় কোনোমতে পার পাওয়াও যায়, তবে নিশ্চিতভাবে জানবেন— আখিরাতে পার পাওয়ার কোনোই সুযোগ নেই। ঈমান ছাড়া আখিরাতে মুক্তি পাওয়া যায় না, যাবে না। ঈমান কেবল অন্তরের বিষয় নয়, একবার কালিমা পড়ে নিলেন তো কেল্লা ফতেহ! ব্যস! এবার যা খুশি তা-ই করতে থাকবেন, না! ঈমান মানে আপনি যেই সাক্ষ্য দিলেন তার ওপর অটল থাকা। আপনার সাক্ষ্যকে নিজের কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা। অন্তরের সাক্ষ্য ও কথার সাক্ষ্যকে সত্য প্রমাণ করা। আপনি সাক্ষ্য তো দিচ্ছেন আল্লাহ ও রাসূলের পূর্ণ আনুগত্যের, তাহলে কীভাবে নামায থেকে দূরে থাকছেন? যেখানে আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে নামাযের গুরুত্ব কি তা আপনার জানা আছে। কীভাবে মুআযযিনের আযান শুনেও আপনি নামায পড়তে যাচ্ছেন না? আল্লাহ যদি কাল কিয়ামতের মাঠে আপনার ঈমানের প্রমাণ চান তো আল্লাহকে কি প্রমাণ দেবেন ভাই ও বোন আমার? আপনি কি সেদিন আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারবেন? কোন মুখে কথা বলবেন আপনি? কারণ, আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর ইবাদাতের জন্য, আর আপনি সেখানে অন্য কিছুর ইবাদাত করেছেন নাহয় মোটেও ইবাদাত করেননি, ঈমানের পরে সর্বপ্রথম কাজ নামাযকেই দিব্যি ভুলে বসেছিলেন দিনের পর দিন, দিনের পর রাত এসেছে তবুও আপনার শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়নি। আপনি সাক্ষ্য দিয়েছেন একরকম, কাজে তার ঠিক উল্টাটাই করে দেখিয়েছেন।

আমার ভাই ও বোনেরা! আপনি কি দুনিয়া নিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত? খুব বেশি বিজি? অফিস, পড়ালেখা আর স্বামী-সন্তান নিয়ে খুব বেশি মশগুল হয়ে আছেন? ইবাদাতের সময় মোটেই পাচ্ছেন না? টাকা-পয়সা অর্জনের পেছনে

সময় দিতে দিতে সময় কীভাবে চলে যায় আপনি টেরই পান না? কিন্তু জানেন কি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি জানিয়েছেন আমাদের? তিনি আল্লাহর একটি বাণী আমাদের নিজের ভাষায় জানিয়েছেন, যেখানে আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ

"হে বনী আদম! তুমি আমার ইবাদাতের জন্য সময় বের করো তবে আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যে ভরে দেবো, তোমার দারিদ্র্য দূর করে দেবো; আর যদি তা না করো তবে আমি তোমার ব্যস্ততাকে বৃদ্ধি করে দেবো আর তোমার দারিদ্র্যকে দূর করে দেবো না।" [২১]

আপনি নামায পড়তে পারছেন না কেননা আপনি নামাযের জন্য সময় নিজে থেকেই বের করে নিচ্ছেন না, ইচ্ছাও করছেন না। আপনি একটু ইচ্ছা করুন। আপনিই সময় বের করার চেষ্টা করুন ইবাদাতের জন্য, সময় বের করুন নামাযের জন্য, দেখবেন কীভাবে যেন সময় বের হয়ে গেছে, ম্যানেজ হয়ে গেছে। দেখবেন আল্লাহই আপনাকে সাহায্য করছেন। এ রকমটা আল্লাহই বলেছেন যে। আর হবেই না বা কেন, মানুষকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সে কাজ করলে তবেই না মানুষের সকল কাজে গতি ফিরে আসবে, ছন্দহীনতা ফিরে পাবে তার হারানো ছন্দ। আপনি নামাযের জন্য সময় বের করেই দেখুন না, তারপর জীবনে কীভাবে পরিবর্তন আসে তাও দেখুন। নামাযকে বোঝা মনে করবেন না, ভাই ও বোন আমার! ইবাদাত তো সহজ। দেখুন আল্লাহ আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে নামাযের ব্যবস্থা রেখেছেন। দাঁড়াতে সমস্যা তবে বসে পড়ো, বসতে সমস্যা শুয়ে পড়ো, শুতেও সমস্যা ইশারায় পড়ো, কিন্তু নামায ছেড়ো না, কোনোক্রমেই ছেড়ো না। কেন জানেন?

কারণ, আল্লাহ চান আপনি আল্লাহর সাথে কমপক্ষে পাঁচবার কথা বলুন, সাক্ষাৎ করুন। কারণ, আপনি তাঁর বান্দা। তিনি আপনাকে ভালোবাসেন। এই কারণেই তো অন্য সকল ইবাদাত থেকে নামাযকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। দুনিয়ার

২১. তিরমিযী, সনদ সহীহ

বুকেই অন্যান্য ইবাদাতকে ফরয করেছেন। আর নামায ফরয করতে তিনি তাঁর হাবীব মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডেকে নিয়ে গেছেন তাঁর কাছে। আপনি কি তবুও বুঝতে পারছেন না আল্লাহ চান আপনি তাঁর সাথে কথা বলুন? আপনি কি জানেন না আল্লাহ এই উম্মাতের ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছিলেন, পরে তা রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুরোধে কমিয়েও ছিলেন, কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মর্তবা আর ফযীলত কিন্তু সেই পঞ্চাশের মতই রেখে দিলেন। অর্থাৎ, আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লেই পাচ্ছেন পঞ্চাশ ওয়াক্তের সাওয়াব। তবুও কি নামায থেকে দূরে থাকতে চান আপনি? কেন? কোন কারণে?

আপনি কি আল্লাহর থেকে দূরে থাকতে চান? কোন আল্লাহর থেকে দূরে থাকতে চান? সেই আল্লাহর থেকে, যিনি পানির একটি ফোঁটা থেকে আপনার সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, ক্রমান্বয়ে মায়ের গর্ভে তিন স্তরের অন্ধকারের ভেতরে রেখে সুরক্ষা দিয়েছেন; যিনি আপনার নিষ্প্রাণ ভ্রূণে প্রাণ দিয়েছেন, মায়ের গর্ভে আপনার বেঁচে থাকার মত উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন, সেই আল্লাহকে? মাংসের দলা থেকে যিনি আপনাকে আকার আকৃতি দিলেন, গর্ভে থাকাকালেই চোখ, মুখ, নাক, অন্তর দিলেন; আপনাকে সেই অসহায় অবস্থা থেকে নিয়ে এলেন এই পৃথিবীতে, তিমির অন্ধকার থেকে দুনিয়ার আলোতে। তাঁকেই ভুলে থাকতে চান?

আপনি কি তাঁকেই ভুলে থাকতে চান যিনি আপনার মায়ের অন্তরে আপনার জন্য পরম মমতা ঢেলে দিয়েছেন, মায়ের মমতা ছাড়া আপনার সেই অবস্থাতে বেঁচে থাকাটা কি সম্ভব ছিলো? কে প্রক্ষেপ করলো এক অপরিচিত শিশুর জন্য মায়ের অন্তরে এত ভালোবাসা? কে আপনাকে শিখিয়ে দিলো কীভাবে মায়ের স্তন থেকে দুধ পান করতে হয়? যে সময়ে একমাত্র খাবারই ছিলো আপনার মায়ের দুধ? কয়েক মাস যেতে না যেতেই কে আপনাকে শিখিয়ে দিলো কীভাবে গিলে খেতে হয়? পরে চিবিয়ে খেতে শিখেছেন, তো কে শেখালো আপনাকে এতকিছু? আপনার মা তো তখন আপনাকে এগুলো শেখাননি, শেখায়নি আপনার বাবাও। একজন সত্তাই আপনাকে অদৃশ্যভাবে সবকিছু শিখিয়ে দিয়েছেন। আর আপনি সেই সত্তাকেই ভুলে থাকতে চান?

কে একই জিহ্বায় এত বাহারি স্বাদ দিলেন? একই সময়ে টক, ঝাল, মিষ্টি, তিতা

স্বাদ কীভাবে পাচ্ছেন আপনি? কখনো ভেবে দেখেছেন? কীভাবে এই ক্ষুদ্র চোখ লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দূরের সেই তারাকে দেখতে পাচ্ছে? কার বলে আপনার হৃদপিন্ড ধুকধুক করছে? কে ফুসফুসকে সচল রেখেছে? কে এই প্রাণকে কার্যকর রেখেছে? শুকনো মাটি থেকে পানির মাধ্যমে ফসল ফলাচ্ছে কে? আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরাচ্ছে কে? কার শক্তিতে সমুদ্রের নিচের প্রাণীরা বেঁচে আছে, কার ইশারায় ঋতু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, কোন সেই শক্তি যা অনবরত দিন আর রাতের পরিবর্তন ঘটিয়ে যাচ্ছে? এত বড় সূর্য, এত সুন্দর চাঁদ, মিটমিট করে জ্বলা তারা কার সৃষ্টি? সৌরবিশ্ব, মহাবিশ্ব, গ্যালাক্সি কোথা থেকে এলো এরা? কার নির্দেশের আজ্ঞাবহ এ সকল কিছু?

ভেবে দেখুন তো! হাত কেটে যাচ্ছে, রক্ত ঝরছে, আবার কয়েকদিন পরে সব দিব্যি ঠিক হয়ে যাচ্ছে; এই আজকে যন্ত্রণায় মাথা উঠাতে পারছেন না, কাল সেই আপনিই এই মাথা দিয়ে ম্যাথ সলভ করে ফেলছেন, রকমারি ভাষা শিখছেন, কীভাবে হচ্ছে এগুলো? যুক্তি-বুদ্ধি-পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা কোথা থেকে এলো আপনার মাঝে? যে জ্ঞানের বলে সকল কিছু টিকে আছে সেই জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা কার দেয়া? অন্য কোনো প্রাণীর জ্ঞান নেই আপনার কেন আছে? তাদের যেই ক্ষমতাও নেই তা আপনারই-বা কেন আছে? কেন তাদের দরকার হলো না আর আপনার দরকার হলো? এতকিছুর কোনো কিছুই কিন্তু আপনার নিয়ন্ত্রণে নেই, তবে আপনি কি আসলেই পূর্ণ স্বাধীন, যেমনটা আপনি দাবী করেন? গতকাল ছিলেন কিশোর, আজ যুবক, কালকে প্রৌঢ় আর পরশু হবেন বৃদ্ধ, আর তরশু এই জীবনের পাঠ চুকিয়ে রওনা হবেন আরেক দুনিয়ার উদ্দেশ্যে, এতেও আপনার নিয়ন্ত্রণ নেই, নেই পরিবর্তনের ক্ষমতা, নেই একচুল নড়ন-চড়নের ইখতিয়ার, তবে কে আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে? এগুলো কি কখনো ভাবার সময় হয়েছে আপনার? আজকেও একটু ভাববেন না? যেই আল্লাহ আপনাকে, আমাকে, প্রতিটি জীব ও অ-জীবকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন, তাঁকেই ভুলে থাকতে চাচ্ছেন? তাঁর দেওয়া বিধান মানতেই আপনার এত কষ্ট হচ্ছে? যিনি আপনাকে আর আমাকে কাল কিয়ামতের দিন ক্ষমা করার জন্য ১০০ ভাগের ৯৯ ভাগ ক্ষমা আর মাগফিরাতই সংরক্ষণ করে রেখেছেন, তাঁকেই আপনি ভুলে থাকতে চাচ্ছেন? সেই ক্ষমা পাওয়ার জন্য তাঁর হুকুম-আহকাম মানার কোনো গরযই আপনার নেই? কেন ভাই? এ রকম কেন হলো বোন?

দয়া করে ভুলবেন না তাঁকে। ভুলে যাবেন না তাঁকে। আজকে আপনি তাঁকে ভুলে থাকবেন, হতে পারে কাল তিনিই আপনাকে ভুলে যাবেন, হতে পারে আপনার নিজের কাছেই নিজেকে ভুলিয়ে দেবেন।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ

"আর তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, ফলে আল্লাহ তাদের আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন।" [২২]

সত্য কথা হচ্ছে, আপনি যখন আপনার জীবনের মালিক, মরণের মালিক, আপনার প্রাণের মালিক, আপনার দেহের মালিক, রুহের মালিককেই ভুলে গেছেন তখন আপনি নিজেকে আর মনে রাখলেনই-বা কোথায়? আপনি তো এমনিতেই আত্মবিস্মৃত হয়ে গেছেন। তাই আর আত্মবিস্মৃত থাকবেন না। চলে আসুন এদিকে। এই যে এদিকে, যেখানে আপনি নিজেকে চিনতে পারবেন, চিনতে পারবেন আপনার রব আল্লাহকে, নিজের প্রকৃত মালিককে। আজই নিজের ঈমানকে নবায়ন করুন, মজবুত করুন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, নামায পড়তে শুরু করুন। কারণ, এই নামাযই আপনাকে আপনার রবের সাথে যুক্ত রাখবে, কানেক্টেড রাখবে। ফলে আপনি আল্লাহকেও ভুলবেন না, নিজেকেও ভুলবেন না।

অলসতা গ্রাস করছে? কাহিল লাগছে? দুর্বল হয়ে গেছেন? হাত-পা ছেড়ে দিয়েছে? খুব ক্লান্ত? নামায পড়তে ইচ্ছেই করছে না? তাও সমাধান আছে। ওপরের কথাগুলো মনে করতে থাকুন। মনে বল নিয়ে উঠে দাঁড়ান। আর প্রিয় রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবান মুবারক থেকে বের হওয়া এই দু'আটি অবশ্যই মুখস্ত করে নিন,

أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ اللهم إِنِّي

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল আযঝি ওয়াল কাসালি

---

২২. সূরা হাশর, ১৯

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। [২৩]

ঈমানদার হয়ে নামায না পড়াটা আমাদের কাছে যেমন স্বাভাবিক হয়ে গেছে তেমনি একটা সময় ছিলো যখন ঈমানদারের জন্য নামায ছাড়ার কথা চিন্তা করাটাই ছিলো অসম্ভব। কেউ চিন্তাও করতে পারত না ঈমানদার হয়ে কীভাবে নামায না পড়ে থাকে? নামায না পড়েও ঈমানদারের খাতায় তার নাম কিভাবে থাকে? কিন্তু সময় ও পরিস্থিতি বদলে গেছে। এখন নামায পড়াটাই যেন আমাদের কাছে অস্বাভাবিক, যেমনটা একসময় নামায না পড়াটাই ছিলো অস্বাভাবিক। কিন্তু ভয় পাবেন না। হয়ত জন্মের পর থেকে আপনি একটিবারের জন্যও আল্লাহকে সিজদা দেননি, হয়ত একটিবারের জন্য পশ্চিমদিকে আছাড় খেয়েও পড়েন নি, হতে পারে আপনার নামায ছিলো দুই ঈদ, শবে মেরাজ, শবে বরাতেই সীমাবদ্ধ; আপনার নামায হয়তবা ছিলো মৌসুমী নামায; হতে পারে ৩০-৪০-৫০ বছর আপনি নামায পড়েন নি, কিন্তু দেরি হয়নি এখনো। জীবন থাকা পর্যন্ত সময় আছে, সুযোগ আছে ফিরে আসার, ভুলকে শুধরে নেওয়ার। তাই আজকে থেকেই নামাযটা শুরু করুন। ভয় পাবেন না, আল্লাহ আপনাকে সুযোগ দেবেন, আপনার গুনাহ-খাতা সব মাফ করে দেবেন। শুধু শর্ত একটাই, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করবেন আজ থেকে আর নামায ছাড়বো না, কোনোমতেই না, কখনোই না। জীবন থাকা পর্যন্ত নামায পড়েই যাবো। এই ওয়াদা নিজের সাথে করুন, আল্লাহ তো আপনার নিয়্যাত দেখছেনই, আপনি সৎ হলে তিনিই আপনাকে সাহায্য করবেন। আগে যেখানে সময় পেতেই হিমশিম খেতেন তখন দেখবেন কীভাবে সময় ম্যানেজ হয়ে গেছে। কারণ, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি যে এখন ভিন্ন, আপনার কাছে এখন আপনার রবই যে বড়, তাঁর স্মরণ আর তাঁর ইবাদাত যে এখন আপনার জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে গেছে, আর আল্লাহর সাহায্যও যে আছে আপনার সাথে। আল্লাহ কি বলছেন তাও সবসময় মনে রাখবেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"যারা আমার পথে চেষ্টা-সংগ্রাম করে আমি তাঁদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব।" [২৪]

---

২৩. সুনানে আবু দাউদ

২৪. সূরা আনকাবূত, ৬৯

এটাই আল্লাহর ওয়াদা। আর তাঁর থেকে কে আছে যে ওয়াদায় বেশি সত্যবাদী? আপনি তাঁর থেকে অধিক সত্যবাদী আর কাউকে পাবেন না। তাই নামাযের দিকে আসুন। আজ থেকেই। এই যে এখন থেকেই। এই ওয়াক্ত থেকেই। আর দেরি নয় এক মুহূর্তও। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আপনাকে রাখবে গুনাহ থেকে মুক্ত।

إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

"নিশ্চয়ই নামায অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।" [২৫]

আর স্বয়ং নামাযের মাধ্যমেই আপনার গুনাহ ঝরে যাবে, আপনার গুনাহ আর অবশিষ্টই থাকবে না।

مثل الصلوات الخمس كمثل نهرٍ غمرٍ على باب أحدكم

يغتسل منه كل يوم خمس مرات

"পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ হলো প্রচুর পানিওয়ালা এক নদীর মতন, যা তোমাদের দরজার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয় আর তাতে দৈনিক পাঁচবার তোমরা গোসল করো।" [২৬]

আর ভাইয়েরা অবশ্যই মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বেন। ঘরকুনো নামাযী একেবারেই হবেন না কিন্তু! পুরুষের নামায গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য জামাআত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা একদিকে নামাযের সাওয়াব যেমন অকল্পনীয়, তার ওপর একা পড়া থেকে জামাআতের সাথে নামায পড়াতে আছে বহুগুণে বেশি সাওয়াব। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"একা নামায থেকে জামাআতের সাথে নামায সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াবের।" [২৭]

---

২৫. সূরা আনকাবূত, ৪৫
২৬. সহীহ মুসলিম
২৭. বুখারী ও মুসলিম

আবার জামাআত ত্যাগ করার ব্যাপারে এসেছে কঠোর সতর্কবাণীও। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! আমার ইচ্ছা হয়, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দিই, তারপর নামায কায়েমের নির্দেশ দিই, এরপর নামাযের আযান দেয়া হোক, তারপর এক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামতি করার নির্দেশ দিই। এরপর আমি লোকদের কাছে যাই এবং তাদের (যারা জামাআতে শামিল হয়নি) ঘর জ্বালিয়ে দিই।" (সহীহ বুখারী)

আপনি কি এটা জানেন যে রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে মুনাফিকরা পর্যন্ত জামাআত ত্যাগ করত না, তা না হলে তাদের মুনাফিকী প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। আসুন একটু ফিরে যাই সেই আরবের বালুকাময় ভূমিতে, টাইম মেশিনে করে রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সময়ে। যোহরের ওয়াক্ত, প্রচন্ড গরমে প্রাণ হাঁসফাঁস করছে, ঠিক এমন সময়ে মদীনার মসজিদ থেকে বিলালের কণ্ঠে ভেসে আসলো সুমধুর আযানের ধ্বনি। এরপর গোটা জনপদে শুরু হলো নামাযের প্রস্তুতি। সবাই যার যার ক্ষেতখামারী, ব্যবসায়-বানিজ্য, ঘরের কাজ ফেলে রেখে রওয়ানা দিচ্ছে ওযু করতে, ওযু করে তারা যাবেন মসজিদ পানে, নামায পড়তে। মুসলিমদের মাঝে ঘাপটি মেরে থাকা ভুয়া ঈমানদার মুনাফিকরাও তৈরী হচ্ছে, হাত পা ধুয়ে তারাও ওযু করে নিচ্ছে, তাদেরকেও মসজিদে যাওয়া লাগবে। কারণ কমপক্ষে এতটুকু কাজ না করলে মুসলিম সমাজে থাকা প্রচণ্ড লজ্জার, আর এতে করে তাদের আসল চেহারা বের হয়ে আসতে পারে। কেননা সাহাবারা কাউকে জামাআতে না দেখলে খোঁজ খবর নিতেন, তার ব্যাপারে তদন্ত করতেন। তাই মুনাফিকরা সাহাবাদের অভিযোগের মুখে পড়তে চাইত না, তারাও জামাআত সহকারে নামায পড়ত, প্রতিদিন, পাঁচ পাঁচবার। চিন্তা করতে পারেন! সেই মুনাফিক, যাদের স্থান হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন তলে, যারা আল্লাহ ও রাসূলের শত্রু, যাদের ক্ষতি প্রকাশ্য কাফির শত্রু থেকেও বেশি ছিলো। আর আজ আযান দিলেও কিনা মুসলিম দাবিদার লোকেরা দিব্যি গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়, জামাআত তো দূরে থাক তারা দেদারসে নামাযই ত্যাগ করে যাচ্ছে! হায় আফসোস! হায় আফসোস! এ কেমন লজ্জা! কতবড় লজ্জা!

তাই ভাইয়েরা, সাথে বোনেরাও! দুনিয়ার জীবনে একটু কষ্ট করুন, আজকের সামান্য কষ্ট কাল কিয়ামতের দিন আপনাকেই শান্তি ও নিরাপদে রাখবে; বরং

যত কষ্ট হবে এর প্রতিদানও হবে তত বেশি, তত মহান। শুনে দেখুন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি বলছেন,

بَشِّرِ المشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى المسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"অন্ধকারে মসজিদে (জামাআতে) গমনকারীদের কিয়ামতের দিন পূর্ণ আলোর সুসংবাদ দাও।" [২৮]

ফজরে ঘুমকে উপেক্ষা করে, অফিস থেকে ফিরে এশার অন্ধকারে জামাআতে যাওয়ার কষ্ট বৃথা যাবে না, আপনার কাছে থাকবে অনেক আলো, পূর্ণ আলো, সেদিন এই পূর্ণ আলো আপনার অনেক কাজে আসবে। আসলে যা কাজে আসবে তা এই আলোই। তাই সময় থাকতে এই আলো কুড়াতে একদমই ভুল করবেন না যেন! সময় কিন্তু বসে থাকে না!

বোনেরা, আপনারা বাসা-বাড়ি, স্বামী-সংসার, রান্নাবান্না, শাড়ি-গয়না সহ যত কিছু নিয়েই ব্যস্ত থাকেন না কেন নামাযটা সময়মত পড়ে নিতে মোটেই ভুলবেন না কিন্তু! প্রথমদিকে একটু কষ্ট হবে, অভ্যাস গড়ে উঠতে একটু সময় লাগবে। কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে পড়তে থাকুন, দেখবেন কেমন সহজ হয়ে গেছে নামায। একসময় দেখবেন নামায না পড়লেই কেমন কেমন লাগবে আপনার। আর আপনাদের জন্য তো আল্লাহ অনেক বড় সুযোগ দিয়ে রেখেছেন। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إذا صَلَّتْ المرأةُ خمسَها ، وصامَتْ شَهْرَها ، وحفظَتْ فَرْجَها ، وأَطَاعَتْ زَوْجَها ، قيل لها : ادْخُلِي الجنةَ من أَيِّ أبوابِ الجنةِ شِئْتِ

"যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযান মাসে রোযা রাখে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, স্বামীর আনুগত্য করে, তাঁকে বলা হবেঃ যে দরজা দিয়ে তোমার ইচ্ছা হয় সে দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করো।" [২৯]

---

২৮. আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

২৯. আহমাদ, তাবারানী

বিপদাপদে আছেন? নামায পড়ুন। জীবনের খেই হারিয়ে ফেলেছেন? আল্লাহর দিকে একান্তভাবে মনোনিবেশ করুন, নামায পড়ুন।

আমার ভাই ও বোনেরা!

ইসলামের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য কি জানেন? তাওহীদ। তাওহীদ মানে হলো আল্লাহকে নিজের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য (Supreme Goal) বানানো, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা, আর কারো ইবাদাত না করা, অন্তরকে শুধু তাঁর সন্তুষ্টির সন্ধানী বানানো। আমরা আজকাল ইয়োগা-মেডিটেশানের নামে হাজার হাজার টাকা ফেলি, কেন? দেহ-মনকে একটু শান্ত করার জন্য। কারণ আমরা আজকাল অনেক ব্যস্ত, আগের থেকে লাইফ এখন অনেক বেশি জটিল ও কঠিন। বস্তুবাদী দুনিয়া আমাদের সামনে এত বড় হয়ে গেছে যে, এর পেছনে ছুটতে ছুটতে আমাদের রুহের খোরাক দেওয়া হয়না। ক্ষুধার্থ থাকতে থাকতে রুহ বিদ্রোহ করে বসে, অশান্ত হয়ে ওঠে। ফলাফল হলো, বস্তুবাদী সাফল্য পদচুম্বন করলেও অন্তরের শূন্যতা পিছু ছাড়তে চায় না। এই কারণে অন্তর আর মনের সংযোগের (Unity) জন্য একটু যোগব্যায়াম আর মেডিটেশান করে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর চেষ্টা করি। প্রথমত, যোগ আর মেডিটেশানের পেছনের কথা আমরা জানি না, এগুলো কি আদৌ আমাদের দ্বীন-ধর্মের সাথে খাপ খায় কি না, এগুলো কি আদৌ জায়েয কি না-জায়েয, এগুলো কি তাওহীদি নাকি শিরকি এসব জানার তোয়াক্কা আমরা করি না। ধরে নিলাম এগুলো জায়েজ, কিন্তু এসব কি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবীদের আদর্শ? আমরা আমাদের দ্বীনকে বুঝি না বলেই এগুলোর পেছনে দৌড়াই।

আল্লাহ আমাদের তাওহীদ দিয়েছেন কেন? তাওহীদ তো এই কারণেই দিয়েছেন যাতে আমরা এক আল্লাহকে চিনি, আমাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করি, আমাদের দুনিয়াতে আসার পেছনের কথাগুলো জানি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো দেবতা, দেবী, সিস্টেম, দর্শন, ফিলোসফি, সমাজব্যবস্থা, কুসংস্কার, সরকার, নেতা-গুতার দাসত্ব যাতে আমরা না করি, আমাদের গোটা অন্তর ও দেহ যাতে একত্র, একীভূত ও একমুখী হয়ে শুধু আল্লাহরই দাসত্ব করে, তাঁরই সন্তুষ্ট খোঁজে, তাঁকেই ভয় করে, তাঁর জন্যই ভালোবাসে, তাঁর জন্যই ঘৃণা করে, শুধু তাঁর কাছেই সকল আশা করে, কেবল তাঁর কাছেই ভিক্ষা চায়, একমাত্র তাঁকেই সিজদা করে, তাঁর কাছেই বিপদমুক্তির প্রার্থনা করে। ব্যক্তির অন্তর, অন্তরে থাকা

বিশ্বাস-দৃষ্টিভঙ্গি, কলব, রুহ, নফসের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দেহ, দেহের চলন-বলন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সকল কিছুকে কেবল এক আল্লাহ ও আল্লাহর দ্বীন-আদেশমুখী করাই তো তাওহীদ। অন্তর আর দেহের এর থেকে সুন্দরতম মিলন (Unity of body and mind) আপনি কোথায় পাবেন, বলুন তো? আর এই তাওহীদের সবচেয়ে উত্তম প্রদর্শনস্থল হলো নামায। নামাযই তাওহীদের প্রতিটি দিককে (aspect) সবচেয়ে সুন্দরভাবে তুলে ধরে। সেই নামাযকেই আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন? কেন বলতে পারেন? যে কারণেই করুন না কেন, আপনি কিন্তু সুখে নেই, আমি জানি। জীবনের ছন্দ কিন্তু ঠিকই হারিয়ে ফেলেছেন। তাই জীবনে ছন্দ ফিরিয়ে আনুন, তাওহীদ বুঝুন, উপলব্ধি করুন, নিজের ফোকাস ধরে রাখার আসল রহস্যকে চিনে নিন, নামায পড়ুন।

রিযকের সমস্যায় আছেন? নামায পড়ুন। মনে প্রচণ্ড ব্যাথা? নামায পড়ুন, আল্লাহকে বলুন। হতাশা ঘিরে ধরেছে? নামাযে দাঁড়ান। নামাযই কিন্তু সবচেয়ে বড় মুনাজাত। নামাযেই কিন্তু দু'আ সবচেয়ে বেশি কবুল হয়। এই কারণেই বলেছি নামায শুধু উপাসনা নয়, নামায আল্লাহর সাথে কথা বলা, আল্লাহর কাছে চাওয়া, নিজের যা কিছু দরকার সবকিছু চেয়ে নেওয়া। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ

"হে মুমিনগণ! আল্লাহর কাছে চাও, ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে।" [৩০]

দু'আ কবুল করাতে চান? তবে নামায আছে আপনার পাশে। যেকোনো দু'আ কবুলের মোক্ষম সময় সিজদাহ। একেবারে অব্যর্থ অস্ত্র যাকে বলে। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَقْرَبُ ما يَكونُ العَبْدُ مِن رَبِّهِ، وهو ساجِدٌ، فأكْثِرُوا الدُّعاءَ

"বান্দা তখন তাঁর রবের সবচাইতে নিকটবর্তী হয় যখন সে সিজদারত থাকে, তাই বেশি বেশি করে এ সময়ে দু'আ করো।" [৩১]

৩০. সূরা বাকারাহ, ১৫৩
৩১. মুসলিম

নামাযে চান, সিজদায় চান, যখন আপনি আপনার রবের সবচাইতে নিকটে অবস্থান করেন। নামায পড়ুন। নামায আপনার নিজের কল্যাণের জন্যই, আপনার রবের জন্য নয়। আপনার রব বেনিয়াজ, অমুখাপেক্ষী, তাঁর কারোর ইবাদাতের প্রয়োজন হয়না।

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ

"আমি তাদের নিকট রিযক চাইনা এবং এও চাইনা যে, তারা আমার আহার যোগাবে।" [৩২]

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো বিপদে পড়লে সর্বপ্রথম যে কাজটি করতেন তা হলো নামায। এটাই আমাদের দ্বীন। হ্যাঁ, এটাই আমাদের দ্বীন। বিপদে পড়লে আমরা নানাজনে নানা কিছু করে থাকি। বিপদে পড়লে তাসবীহ, তাহলীল, তাহমিদ পড়াটা আমাদের কাছে কেমন যেন সেকেলে সেকেলে! লাগে। বিপদে পড়লে হতাশা প্রকাশ, হা-হুতাশ করাটাই যেন আমাদের কাছে স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করতেন ঠিক তার উল্টোটাই। এর মাধ্যমে উম্মাতের জন্য তিনি শিক্ষা রেখে গেছেন। বিপদাপদে পড়লে মানুষের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, অগোছালো হয়ে পড়ে অন্তর। এই কারণেই বিপদের প্রথম আঘাতটিই আল্লাহর সিজদা কিংবা আল্লাহর স্মরণ দিয়ে মোকাবেলা করা হোক। যাতে আল্লাহর দাসত্বমনা মনোভাব সামান্য সময়ের জন্যও আমাদের ভুলোমন ভুলে না বসে। আল্লাহর দাস হিসেবে যেকোনো বিপদের কথা সবার আগে তাঁর নিকট বলাই আমাদের কর্তব্য। এভাবেই নামায আমাদের সবসময়, এমনকি বিপদাপদের মত কঠিন সময়েও, আল্লাহর সাথে যুক্ত রাখে। যুক্ত রাখে আল্লাহর দাসত্বের সাথে। সেই নামাযকেই আপনি ত্যাগ করে যাচ্ছেন, প্রতিনিয়ত, প্রতিদিন। কী আশ্চর্য তাই না?

---

৩২. সূরা যারিআহ, ৫৭

জীবন্ত নামায

মানুষের স্বভাব সে বড় হতে চায়। তেমনি বড় কাউকে দেখলে সে নিজেকে ছোট করে প্রকাশ করে। স্যার, ডাক্তার, অফিসার, বাবা-মা'র সামনে আমরা কেমন চুপসে যাই। আমাদের ভেতরের বাঘটা বড় কাউকে দেখলে তাদের সামনে বসলে বিড়ালের মত লেজ গুটিয়ে থাকে। আমরা চুপচাপ তাদের কথা শুনি, তাদের দিকে চেয়ে থাকি, তারা কি বলেন তা বোঝার চেষ্টা করি। কিন্তু আশ্চর্য কথা মানবস্বভাবের এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম যেন নামাযের ক্ষেত্রে এসে পুরোপুরি ইউটার্ন নিয়ে নেয়। নামাযের মধ্যে চোখ এদিক সেদিক নাচানো, চুল ঠিক করা, দাড়ি নিয়ে খেলা করা, ঘড়ির স্ক্রু নিয়ে নাড়াচাড়াসহ কত কিই-না করি। কিন্তু আমরা তো নামাযে দণ্ডায়মান। আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে। আল্লাহর সামনে! এই জগত ও এরকম লক্ষ জগতের একচ্ছত্র অধিপতি। কয়েক হাজার মাইল বিস্তৃত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী তো এই মালিকের সামনে কিছুই না। কোথায় ক্লাসের স্যার আর কোথায় এই মহান বিচারক! বড় মানুষের সামনে আমরা যেই শিষ্টাচার নিয়ে দাঁড়াই তার সামান্য অংশও যদি মহামহিম আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর সময় আমাদের মাঝে থাকত! কি আশ্চর্য! থাকে না! কখনো একদমই থাকে না! কেন এরকম হলো? মানুষের স্বভাব এসময় এরকম বিদ্রোহ করে কেন?

আসলে মানুষের স্বভাব বিদ্রোহ করে না। সে তার স্বাভাবিক গতিতেই চলছে, চলে। সমস্যা হচ্ছে সত্যিকারার্থে আমরা আল্লাহকে ওত বড় মনে করি না। আন্তরিকভাবে আল্লাহর বড়ত্বের অনুভূতি ও উপলব্ধি আমাদের চেতনা থেকে অচেতনে প্রবেশ করতে পারেনি। তাই আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোকে আমরা খুব বেশি কিছু মনে করি না। ব্যায়ামের মত কিছু কসরত করলে আর দু'রাকাত নামায এক-দেড় মিনিটে পড়েই আমরা ভাবি নামায হয়ে গেছে। আসলে নামায একে বলে না। হ্যাঁ, আইনী দৃষ্টিতে নামাযী বলে গণ্য হতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর কাছে আমি, আপনি যে কদ্দুর নামাযী তা কিয়ামতের দিনই প্রকাশ পাবে।

নামায তখনই উপকার দিতে পারবে যখন নামায নামাযের মত করে পড়া হবে। নামায তাওহীদের উচ্চতম প্রদর্শন, নামায আনুগত্যের প্রশিক্ষণ কোর্স, নামায গুনাহ্ দূরকারী, নামায কিয়ামতের দিন আলো দেবে—এর সবকিছুই সত্য, এতক্ষণ আমরা এসব আলোচনা করেও এসেছি। কিন্তু কোন নামায? যেই নামাযে দাঁড়িয়ে দোকানের হিসাব কষা হবে, মন এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করবে, নামাযের পাটিতে দাঁড়িয়ে আগামীকালের পরীক্ষার টেনশনে ভীত হওয়া হবে, সেই নামায? কখনোই না। এই নামাযে বেশির থেকে বেশি কিছু কসরত হতে পারে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাড়াচাড়া হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতার্থে নামাযের উপকার তো এর মাধ্যমে হতে পারে না। যেই নামাযে খুশু-খুযু থাকে না সেই নামায খুব বেশি উপকার করতে পারে না।

খুশু-খুযু কি জিনিস? অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা বিনয়, স্থিরতা, প্রগাঢ় মনোযোগ, প্রশান্তি। আল্লাহর বড়ত্বের সামনে নিজেকে ছোট করে দেখা, নিজের দম্ভ-অহংকারকে গুঁড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর মহত্ত্বের সামনে মাথা নুইয়ে দেওয়া, স্থিরভাবে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকা, প্রশান্তচিত্তে নামাযের একেকটি অংশ আদায় করা, আল্লাহর স্মরণের প্রতি নিজের সকল মনোযোগ ঢেলে দেওয়া—এগুলোই তো আসলে নামায। তাওহীদের সর্বোত্তম ফল তো এগুলোই। নামাযের মাধ্যমে এগুলো চর্চা হয় বলেই তো নামায সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত। এ কারণেই তো মুমিনরা সর্বপ্রথম নামাযের জন্য আদিষ্ট। এগুলো না থাকলে নামায প্রাণহীন দেহের মত, যাতে সবকিছু থাকলেও শুধু প্রাণটাই নেই! আজ নামাযীদের মধ্যে এগুলো উঠে গেছে বলেই নামায আজ আর গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে রক্ষা করতে পারছে না। এগুলো নেই দেখেই নামাযী ব্যক্তি মিথ্যা বলে, ঘুষ খায়, সুদী কারবার করে, যুলুম করে, যালিমদের সাহায্য করে। যদি এগুলো থাকত তবে নামাযীদের পক্ষে এগুলো করা সম্ভব হত না।

আসলে নামাযে খুশু-খুযু ধরে রাখাটা কষ্টের কাজ। তার থেকেও কষ্টের কাজ খুশু-খুযুর ভাব আনয়ন করা, বিশেষত এই যুগে। খুশু-খুযু অন্তরের বিষয়। আর তো কোনো অন্তর মেশিন না। নামাযের সময় খুশু-খুযুর বাটন প্রেস করলাম, খুশু-খুযু আসলো, আবার নামায থেকে বেরিয়ে বাটন টিপে প্রসেস বন্ধ করে দিলাম। নামাযে খুশু-খুযু আনতে হলে গোটা জীবনেই খুশু-খুযু স্থাপন করতে হবে। গোটা জীবনে খুশু-খুযু আনার অর্থ নামায বাদে অন্যান্য ক্ষেত্রেও নিজেকে আল্লাহর সামনে, আল্লাহর বিধানের সামনে নত করে রাখা। ঘরে-বাহিরে, পরিবারে-কর্মস্থলে, মসজিদে-অফিসে, ব্যক্তি-সমষ্টি সকল স্থানেই আল্লাহর বিধানের উপস্থিতি থাকা

প্রয়োজন। আপনি ঘর থেকে আল্লাহর বিরুদ্ধতা করে আসবেন আর মসজিদে এসে নামাযের মুসল্লায় দাঁড়িয়ে খুশু-খুযু কামনা করবেন, তা হতে পারে না। অফিসে ঘুষ খাবেন, মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নেবেন, তাদের ওপর নিজের ক্ষমতার বীরত্ব প্রদর্শন করবেন আর ভাববেন নামাযে দাঁড়িয়ে সুবোধ বালকের মত আল্লাহর সামনে নত হতে পারবেন—এমনটা হওয়ার নয়। নামাযে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাওহীদের স্বীকৃতি দেবেন, আর দুর্গাপূজার মণ্ডপে যেয়ে সৌন্দর্য অবলোকন করবেন, আর ভাববেন নামাযের হক আদায় হচ্ছে—ভুল ভাবলেন। আল্লাহর সামনে সিজদায় অবনত হলেন আর বাহিরে যেয়ে মানুষের ওপর অন্যায় মামলা ঠুকে দিলেন আর ভাবলেন আমি তো নামাযী, তাহলে আপনার চিন্তায় সমস্যা আছে। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সংশয় আর সন্দেহ মন-মগজ-মস্তিষ্কে ঢোকাবে আর প্রত্যাশা করা হবে তারা ইয়া বড় আল্লাহওয়ালা হবে, নিঃসন্দেহে তা আকাশকুসুম স্বপ্ন।

খুশু-খুযুর বিষয়টা এতটাও সহজ নয়। প্রকৃতার্থেই খুশু-খুযু আনতে হলে গোটা জীবনকে আল্লাহর আনুগত্য দিয়ে সাজাতে হবে। নামায ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের বিপরীতে চলে নামাযে দাঁড়িয়ে কখনোই আল্লাহর বড়ত্ব বোঝা, আল্লাহর ভয়ে নত হওয়া, আল্লাহর সাথে ঐক্য-সংযুক্তি স্থাপন করা, তাওহীদের ফল আহরণ করা, মনকে স্থির ও প্রশান্ত করা, ধ্যানমগ্ন হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করা সম্ভব নয়।

তার মানে এই নয় যে, মনের এরকম অবস্থা আসার আগ পর্যন্ত নামায পড়া যাবে না। মোটেও না, নামায পড়তেই হবে। তবে সাথে সাথে চেষ্টা করতে হবে যাতে নামাযের মাঝে রুহ ফুঁকে দেওয়া যায়, নামাযের মাঝে প্রাণ সঞ্চার করা যায়, নামায থেকে প্রকৃতার্থেই ফায়দা হাসিল করা সম্ভব হয়। ভীষণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে নিজের জীবনকে আল্লাহর আনুগত্য দিয়ে সাজানোর, যতটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। আল্লাহ কখনোই বান্দার ওপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেন না। বান্দা চেষ্টা করলে আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন। সেই অনুযায়ীই তিনি বান্দার জন্য পুরষ্কার প্রস্তুত রাখেন। আমাদের কাজ চেষ্টা করা, ফলাফল ও প্রতিদান দেবার মালিক তো তিনিই। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে তাওফীক দিন জীবন্ত নামায আদায়ের, আমীন।

শেষকথা

আমার ভাই ও বোনেরা!

আপনাদের এই ভাইয়ের ভাষাজ্ঞান নড়বড়ে, প্রকাশভঙ্গি আরও দুর্বল, শব্দমালা স্বল্প। আমি দুর্বল হলেও আপনাদের ভালোবাসার ক্ষেত্রে অনেকটা সবল। আমি চাই আযান দেয়া মাত্রই ঘরে ঘরে, বাজার-হাটে, অফিসে-কারখানায় শুরু হোক নামাযের প্রস্তুতি, পানিগুলো আমাদের হাতে-মুখে আছড়ে পড়ুক, আমাদেরকে পবিত্র করুক, মুখগুলো যিকরে মশগুল হোক, আর কয়েক মিনিটের ভেতরেই যাতে লক্ষ লক্ষ মুসলিমের মাথা রবের সামনে সিজদায় নুয়ে পড়ে, এই দৃশ্য ফেরেশতারা দেখে রহমতের দু'আ শুরু করে দেন, আর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক আমাদের ওপর, পুরো মুসলিম উম্মাতের ওপর। তাই শুরু হোক নামাযের মিশন। আজীবন এই মিশনে অবিচল থাকার প্রতিজ্ঞার শুরুটা হোক আজই। আর একটুও দেরি নয়, বিলম্ব নয় এক মুহূর্তও। আজকে থেকেই মনস্থির করে নিন, আর কখনোই নামায ছাড়বো না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের বাঁচিয়ে রাখবেন ততদিন পর্যন্ত আর এক ওয়াক্ত নামাযও ছেড়ে দেবো না। 'আর ছাড়বো না নামায' এই হোক তবে ব্রত। একটু পরেই মুআযযিন সাহেব আযান দেবেন। মুআযযিনের 'হাইয়া আলাস সালাহ' বলে ডাক দেবেন। সাড়া দিন। প্রস্তুতি নিন। ধীরস্থিরভাবে নামাযের দিকে আগান। এগিয়ে যান কল্যাণের দিকে।

নোট

নোট

লেখক পরিচিতি

লেখক হিসেবে পরিচয় দেবার মত কেউ নই আমি। জন্ম গ্রামের বাড়ি নড়াইলে। বেড়ে ওঠা ঢাকায়। স্নাতক শেষ করেছি হিসাববিজ্ঞান বিভাগে। এখন এ বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করছি।

লেখালেখিটা আসলে আমার পেশা নয়, শখও নয়। কারণ, লেখালেখিকে পেশা বা শখ হিসেবে নেওয়ার কোনো বিষয় আমি মনে করি না। নিজে যাকে সত্য বলে মনে করি তা জানানোর জন্যই মূলত লেখালেখি। এটাকেই আমি লেখালেখির আদর্শ বলে মনে কররি। যতদিন আল্লাহ হায়াত রাখেন ততদিন লিখে যাবো, যদি নিজে জেনে থাকি তো।

লেখালেখির যাত্রাটা খুব বেশিদিনের নয়। সাড়ে তিন কি চার বছরের মত। সেই সুবাদে কিছু বই বেরিয়েছে আর কিছু বের হওয়ার অপেক্ষায়, যার বেশিরভাগই অনুবাদ, অল্পকিছু মৌলিকও আছে। 'ইসলাম একমাত্র দ্বীন' 'বিয়ে করিয়ে দিন', 'বাসবো না আর ভালো', 'সত্যকথন (সংকলন)', 'সূরা আসর সফলতার মাপকাঠি (অনুবাদ)', 'অভিশপ্ত রঙধনু (অনুবাদ)', 'হেদায়াতের সূচনা (অনুবাদ)', 'নৈতিকতাঃ কুরআনী দৃষ্টিকোণ (অনুবাদ)' নামক বইগুলো প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

যে দুনিয়ার পিছনে আপনি জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে দিচ্ছেন, নিজের মূল্যবান সময়কে করছেন নষ্ট, আপনার আখিরাতের সবচেয়ে বড় পাথেয় ঈমান ও নামাযকে করছেন অবহেলা; সেই দুনিয়া তো আপনাকে সেই বিপদের দিনে রক্ষা করতে পারবে না। পারবে না এক চিলতে আলোর মশাল জ্বালতে, পারবে না আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদের কাঠগড়ায় প্রশ্নের উত্তর দেয়াতে, পারবে না মিযানে নেকীর পাল্লা ভারী করতে, পারবে না পুলসিরাতের ব্রিজে একটুখানি আলো দিতে, না পারবে আপনাকে দ্রুত পুলসিরাত পার করাতে; তাহলে কি সেই দুনিয়ার জন্য নিজের মূল্যবান সম্পদ নষ্ট করার মত বোকামিতে লিপ্ত আছেন আপনি? কি অদ্ভুত, তাই না?

রাইয়ান প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা,
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৮১০০৪৭৭৬৩

Design : Siddik Mamun 01619997770